প্রকাশ কুটির
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম দিনের সূর্য



গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাবলীগ জামাতের জীবিত কিংবদন্তী, জগদ্বিখ্যাত

মাওলানা তারিক জামিলের আলোচনা

রূপান্তর : শফিউল্লাহ কুরাঈশী

الم نشرح لك صدرك - ووضعنا عنك وذرك - الذى انقض ظهرك

‘আমি কি আপনার বুক খুলে প্রকাশ করে দিইনি? আমি হালকা করেছি আপনার বোঝা। তা ছিল আপনার জন্যে খুবই দুর্বহ।’

-সূরা আল ইনশিরাহ

আমাদের প্রথম প্রকাশ "কে সে জন?!" সুধীমহল ও সাথীভাইদের কাছে এমন আশ্চর্য আদর কুড়োবে ভাবতেও পারিনি। পরম করুণাময় দেখছি সব সময় তাঁর মায়ার ছায়া মেলেই রেখেছেন আমাদের মাথার ওপর। তিনিই ফের নতুন বই বের করে দিলেন।

সত্য প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ অব্দি মানুষ আর জিন সেই সত্যের সুশীতল ছায়ায় ঠাঁই নিক এই ব্যাকুল, সুতীব্র আকাঙ্খা ছিল এই প্রেরণার ইন্ধন।

সবাই ভালো থাকুন।
সবার মঙ্গল হোক।
আল্লাহ হাফিজ।

শফিউল্লাহ কুরাঈশী
শাবান ১৪২৪
১৯৪/২ পূর্ব কাজীপাড়া,
ঢাকা-১২১৬

بلغوا عنى ولو اية

পৌঁছে দাও, যদি একটা আয়াতও জেনে থাকো।
-আল হাদীস

এক

সত্যিই দিন বটে একটা!

হাশরের মাঠের মতো তেতে আছে পৃথিবীর বুক। দিল্লীর প্রাচীন পথ ঘাট। উল্কা গতিতে ছুটে চলেছে মেদিনীর মানবজাতি। রুটি রুজির খোঁজে। ঘট ঘট ঘটাঙ ঘট শব্দে চলেছে ট্রেন। ঢিমে তেতালা চালে। পণ্যদ্রব্যের বাহারি বিজ্ঞাপন গায়ে নিয়ে বাতাসে ঝড় তুলে ছুটে চলেছে বাস। মটর, ট্যাক্সির কালো ধোঁয়ার আক্রমণে অস্থির পথচারী। একটু থমকে দুটো বাজে শব্দ ছুঁড়ে ফের পা বাড়িয়েছে গন্তব্যের দিকে। পৌঁছুতেই হবে তাকে। নির্দিষ্ট লক্ষে। বাঁচার তাগিদে। সে জানে না যেখানে যাচ্ছে তা ঠিক না বেঠিক, সত্য না মিথ্যা। সে শুধু জানে তাকে বাঁচতে হবে। প্রাণপণ যুঝে জোটাতেই হবে চারটে ডাল-ভাত-রুটি। বাসায় তার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস এনে আশায় আশায় পথ চেয়ে রয়েছে ক'জন অবুঝ শিশু, বালক, ক'জন অবলা নারী। তার সন্তান। তার স্ত্রী, মা, বোন। প্রচন্ড বেগে চলেছে ছুটে মাটির মানুষ। এ মানুষের যেন একটাই

জীবন। মৃত্যু নেই। সে ভুলেছে তার আসল ঠিকানা। মনে নেই তার জন্ম রহস্যের কথা। এক ফোঁটা নোংরা পানিতে লুকিয়ে ছিল সে কিভাবে।

কোথায় চলেছ মানুষ?! কতদূরে যাবে আর? দাঁড়াও পথিক!

মনে কি পড়ে কোথা হতে এসেছ তুমি? কোথায় তোমার শুরু? কোথায় তোমার শেষ? চারটা ডাল রুটির জন্যে সব ভুলেছ তুমি। তোমার ঘেমে নেয়ে ওঠা ক্লান্ত শরীরে মেখে নাও পরম প্রভুর অবারিত বাতাসের একটু ছোঁয়া। ওই যে দেখা যায় বিশাল বটগাছ। ঘন নিবিড় তার ছায়া। তুমি একটু থামো এখানে। বসো। জিরাও। এসো, মুছে ফেলো তোমার সোনালী ঘাম। এখন শুধাই, 'পথিক, তুমি কি অমর? কি বললে? প্রতিটি প্রাণীই মরণশীল!'

كل نفس ذائقة الموت

তাহলে বলো, 'কি কি তুমি তৈরি নিয়েছ, হে মৃত্যু পথযাত্রী?'

তুমি বোবা। নির্বাক। চুপ।

ওই দেখো, থেমে গেছে বটের পাতার মর্মরধ্বনি। লজ্জা পেয়েছে। ওই দেখো ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ। বিবর্ণ। বেদনা বিধুর। ওরা জানে ওদের সৃষ্টি হয়েছে ধ্বংসের জন্যে।

ওই দেখো, অবোধ পশুদের। ওরা নিস্তব্ধ। ভাবছে। মৃত্যুর কথা।

মাটিতে কান পেতে শোনো। কী? কান্নার শব্দ! হাজার বছরের রুদ্ধ কান্নায় ফেটে পড়ছে কবরের মানুষেরা। তারা বলছে, 'ও পৃথিবীর মানুষ, তোমরা তৈরি না হয়ে এখানে এসো না। এখানে বড় বিপদ! বড় ভয়ঙ্কর জায়গা এটা। একবার ধরা পড়লে মুক্তির আর কোনও পথ নেই। মুক্তির উপায় কি? মরার আগেই মরে যাও। ঝামেলা মুক্ত হও। যা ছেড়ে চলে আসতে হবে তা তোমাকে ছাড়ার আগেই তুমি তাকে ছেড়ে দাও।'

গোটা প্রকৃতি জুড়ে একই চিৎকার, 'মানুষ বাঁচো! বাঁচো! বাঁচতে যদি চাও মরার আগে মরো। শত কোটি বাঁকা চোখ আর কথার আঘাত স'য়ে সাজো নবীর তরীকায়। আর আল্লাহতালার আদেশ মানো শত ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে। মহাসাগরের ঢেউ, ঘাসের শিশির কনা, আকাশের ঘন নীল, অরণ্যের গাঢ় কালো সবুজ, মরুভূমির ঝিকিমিকি বালু আর জীব জানোয়ার নিরব ভাষায় চিৎকার করে

চলেছে। আকুল আর ব্যাকুল স্বরে, মানুষ দাঁড়াও।' একটু থামো।

কেন?

কারণ তোমার সামনে-

মৃত্যু!

মৃত্যুর ছোঁয়ায় নিথর হয়েছে বস্তি নিযামুদ্দিনের দুপুর।

মাথার ওপর সূর্য। প্রচন্ড রাগে যেন ফেটে পড়বে। এখনি যেন নেমে আসবে বিঘত ওপরে। ফাটল ধরবে মাথায়। কানের লতি চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়বে মগজ আর ঘিলু।

হঠাৎ যেন প্রচন্ড শোকে পাথর হয়ে পড়েছে প্রকৃতি। কয়লার কালো ধোঁয়ায় ঢাকা নির্মল নীলাকাশ চোখে পড়ে না। কিসের বেদনায় বিধুর হয়ে আছে চারদিকের পাথুরে পাহাড়। কী নিয়ে যেন ফিস করছে গাছপালা, তরুলতা। তারা কী শুনতে পেয়েছে কোনো আগমনী বার্তা? সোনালী সংবাদ? আনন্দের? শান্তির?

হাজার বছর পর আজ আবার কি পাহাড় চিরে বেরিয়ে পড়বে অমল ধবল ঝর্ণাধারা? অনন্ত কালোরাত্রি শেষে ফুটবে সোনালী সূর্যচ্ছটা? অনেক বছর আগে আচমকা পাথর হয়ে যাওয়া সাউথ ডাকোটার রহস্যময় পেট্রোয়াড ফরেস্টের পাথুরে কীট পতঙ্গ, গাছ পালা আবার কি অবিশ্বাস্য কোনো ছোঁয়া পেয়ে ফিরে পেলো প্রাণ?

এ প্রাণের সাড়া সুতীব্রভাবে অনুভব করলেন নিযামুদ্দিনের বাঙলাওয়ালী মসজিদের আধো আলো আঁধারির ভেতর ঠান্ডা মেঝেয় বসে থাকা বিশাল পাগড়ি পরিহিত গভীর ধ্যানে তন্ময় প্রাচীন (মন-মানসিকতায়) বেঁটে খাটো মানুষটি। প্রচন্ড আধ্যাত্মিক ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠলেন তিনি। কিন্তু কোনও রহস্য বুঝলেন না।

তিনি চিন্তা করছিলেন মানুষের মুক্তির কথা। নবী আসবেন না। পথহারা মানুষকে পথ দেখাবে কে? কিভাবে? কি উপায়? পথ খুঁজছিলেন। চিন্তার সাগরে ডুবে। আঁতিপাঁতি করে। তখনই অনুভব করলেন তাঁর মনের বন্ধ চোখের সামনে খুলে যেতে চাইছে একটি দরজা।

কিন্তু---

খুলি খুলি করেও খুলছে না। হয় হয় করেও ভোর হচ্ছে না। ভোরের আলো ওঠার সময় এখনও হয়নি। পুবের আঁধার আকাশ চিরে সূর্য ফোটার সময় এখনও হয়নি। নিচে সূর্যমুখী তাই অপেক্ষায়। তন্ময়। ব্যাকুল। কখন ফুটবে সেই আলো?

সেই অপেক্ষার কষ্ট, সেই বেদনার জ্বালা, সেই সোনালী স্বপ্নের ব্যাকুলতায় কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ছে বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা। মূল শহর দিল্লী থেকে অনেকটা দূরে নিযামুদ্দিন আওলিয়ার মাজারের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা টাঙ্গা। মাথায় অসংখ্য প্যাঁচকষা ময়লা চিতে পড়া বিশাল পাগড়ি। প্রচন্ড গরম। ঘামছেন তিনি। দর দর করে। কিন্তু তার হৃদয়ে শীতল হাওয়া কাঁপন তুলছে। তিনি জানেন না এর রহস্য কি। ফিরে যাবার কথা ভাবেন। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে বলছে, "একটু দাঁড়াও"। তারপরেই তিনি ঝিমুচ্ছেন। এই ক্লান্তি কোত্থেকে আসে? কেন তিনি যেতে চাইছেন অথচ যেতে পারছেন না?

নিঝুম দুপুর।

নিঃসঙ্গ কাক গাছের ডালে ঝিমুচ্ছে। তার মুখে নেই কা-কা রব। দূরে কুতুব মিনার। সূর্যের ছটা পড়ে ঝকমক করছে। চোখ ঝলসে যায় সেদিকে দৃষ্টি পড়লে। মাঝে মাঝে দু'একটা এক্কা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে। আউলিয়ার মাজারে ধনী দর্শনার্থী নিয়ে এসেছে দামী মটর গাড়ি। কেউ এনেছে জুড়িগাড়ি। মাজারের গভীর নিরবতা ভেঙে এঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ তুলে যাত্রী নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। রেখে যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর বিলাসী বিজ্ঞানের বিষ কালো ধোঁয়ার চিহ্ন। লাওয়ারিশ কুকুর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। তাদের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মাজারের সিন্নির হাঁড়ির দিকে। মাজার সংলগ্ন বিশাল বৃক্ষের ডালে নানা ধরনের পাখি। ডাকা ডাকি করছে। কিচির মিচির করে। অদূরে দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশন। অপেক্ষমান যাত্রীদের হুঁশিয়ার করে বেজে ওঠে সুদূরের বাঁশি। তার শব্দ শোনে মাজারের নাম না জানা পাগল, দরবেশ আর সুফীরা। সব শব্দ ম্লান হয়ে যায় যখন বিদেশী বোমারু বিমান পাক খায় মাথার ওপর। তারপরই বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় নীল নিঃসীমে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র ক'বছর আগে।

ক্লান্ত টাঙ্গাওয়ালা। তিনি জানেন না বিজ্ঞানের ধ্বংস লীলা। তিনি চেনেন না জার্মানীর হিটলার বা ইটালির মুসোলিনীকে। তিনি চেনেন না উইন্সটন চার্চিল বা জারকে। তিনি অতি ক্ষুদ্র অসহায় এক মেওয়াতী। একজনকে শুধু চেনে। তিনি জানেন অমিত ক্ষমতার অধিকারী ওই ছোট খাটো মানুষটি। তাঁকে যেন চিনেও চিনতে পারে না। বুঝেও বুঝতে পারে না। চেনা জানা শোনার মাঝে চলে গেছে অনেকগুলো বছর। তবুও যেন ঠিক ছোঁয়া যাচ্ছে না এই মাঝ বয়েসী মৌলভীর রহস্যময় গতিবিধিকে। তিনি শুধু এটুকু জেনেছেন লোকটা অন্য এক জগতের মুকুটহীন সম্রাট। যে তাঁর কাছে যাবে সে পাবে অমূল্য রতন। যা মানুষ পেলে ধন্য হয় তার অনন্ত জীবন। শান্তি। অনাবিল শান্তির নীড় ওই মানুষটির আশ্রয়। বাঙলাওয়ালী মসজিদের আবছা আলোর ঠান্ডা মেঝে আর মিম্বর।

এখনই সেখানে পৌঁছুনো দরকার।

কিন্তু যেতে পারছে না কেন সে?

কেউ কি হবে তার সহযাত্রী?

কে সে?

এই নিথর ভরদুপুরে কে হবে তার যাত্রী?

নিরব ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে দিল সে মাজারের পাথুরে দেয়ালের দিকে। ওখানে ঘুমিয়ে আছেন নিযামুদ্দিন বাদাউনী রহমতুল্লাহি আলাইহি। অমর মানুষ। কত ইতিহাস তাঁকে ঘিরে। সব যেন দেখতে পাচ্ছেন টাঙ্গাওয়ালা।

দিল্লী তখন শাসন করছেন সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তুঘলক।

সে সময় দিল্লী থেকে অল্প দূরে-জঙ্গলে ঢাকা নিযামুদ্দিনে এলেন এক ফকির। বাদাইয়ুন থেকে। ধর্ম প্রচারের জন্যে। কেমন এক চঞ্চলতার সৃষ্টি হলো বনের পাখিদের মাঝে। কলকাকলি থামিয়ে তারা দেখতে লাগলো আলোকিত পুরুষটির অদ্ভুত কাজ। তিনি প্রথম ক'টা রাত বনের নিদহারা জীব জানোয়ারের সাথে রাত জেগে কাটালেন। একটা বৃক্ষের নিচে। কখনও রুকুতে, কখনও সিজদায়। কখনো কওমায় (দাঁড়ানো), কখনো জলসায় (বসা)। তাঁকে দেখলো বনের পশু, কীট পতঙ্গ। তারা অবাক। এমন মানুষ! বনে থাকে। রাতভর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কার কাছে কি চাইছেন?

কদিন পর। তারা দেখলো দরবেশ কিছু ডালপালা সংগ্রহ করে বাসা তৈরি করছেন। বৃক্ষের ছায়ার নিচে। এক মানুষ সমান উঁচু দেয়াল, মাথা ঝুঁকে ঢুকতে হয় এমন তার দরজা। ডালপালা দিয়ে ছাদ।

দিন যায়। বন যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরে ওঠে নিরব বন। শুরু হলো লোকজনের আসা যাওয়া। ঢোকে কালো, বিবর্ণ, বিষাদক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে। বন থেকে বের হয় আলো ঝলমল মুখ নিয়ে। আনন্দের বান ডেকেছে যেন সারা দেহ জুড়ে।

কী পেয়েছে ওরা? ওখানে? রাজপ্রসাদ ছেড়ে ফকিরের আস্তানায় কী পেল? কি সেই মহার্ঘ বস্তু? কোন্ সে অমূল্য রতন?

পরশ পাথর?

বনের পশুরা জানে না পরশ পাথরের নাম। ওরা শুধু কলকাকলি বন্ধ রেখে চেয়ে থাকে। মানুষটির দিকে।

মানুষটি হযরত খাজা নিযামুদ্দিন আওলিয়া। তিনি ছিলেন সুলতানুল মাশায়েখ। মাহবুব ইলাহী তাঁর উপাধি। মূর্তিপুজারীর দেশ হিন্দুস্থানকে যাঁরা বেলায়েতের নূর দিয়ে আলোকিত করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গাঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির ওইসব খলিফাদের মধ্যে ছিলেন যাঁরা নিযামিয়া সিলসিলা কায়েম করেছেন। তিনি গাউস, কুতুব, খোদাগতপ্রাণ-এসব ধাপ পেরিয়ে 'মাহবুবে ইলাহী'র স্তরে উঠেছিলেন। তাঁর আসল নাম মুহাম্মদ। বংশের ধারা পৌঁছেছে হযরত আলী কাররামাল্লাহুওয়াজহাহু পর্যন্ত। মুহাম্মাদ ইবনি সাইয়্যেদ আহমাদ, ইবনি সাইয়্যিদ আলী (কোনও কিতাবে লেখা রয়েছে তাঁর দাদার নাম দানিয়েল। বিভিন্ন মহলের ধারণা তাঁর দাদার নাম সাইয়্যিদ আলী), ইবনি সাইয়্যিদ আহমাদ মাশহাদী, ইবনি সাইয়্যিদ আলী আবদুল্লাহ, ইবনি সাইয়্যিদ আলী আসগর, ইবনি সাইয়্যিদ জাফর আলী,ইবনে ইমাম আলী হাদী নাক্কী, ইবনি ইমাম মুহাম্মাদ তাক্কী, ইবনি আলী রেজা, ইবনি ইমাম মুহাম্মাদ বাকির, ইবনি ইমাম আলী জায়নুল আবেদিন, ইবনি ইমাম হুসাইন ইবনি হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। বোখারা থেকে হিযরত করে লাহোরে এসেছিলেন আহমাদ ইবনি দানিয়াল গাজনভী রহমতুল্লাহি আলাইহি। পরে বাদাইয়ুনে চলে আসেন।

বাদায়ুন যুক্ত প্রদেশের নাম করা স্থান। পতঙ্গীটোলা এই জিলার একটা গ্রামের নাম। মাহবুবে ইলাহী এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা খাজা আলী রহমতুল্লাহি আলাইহি আর নানা খাজায়ে আরব সাইয়্যিদ আবুল মাক্কা সপরিবারে বাদায়ুনে বসতি নেন। তাঁরা দুজনেই বুজুর্গ আর আত্মীয়। খাজায়ে আরবের কন্যা যুলাইখার সাথে খাজা আলীর ছেলে সাইয়্যিদ আহমদের বিয়ে হয়। খাজা আহমাদ একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। দিল্লীর সুলতান তাঁকে বাদায়ুনের কাজী করেছিলেন। বাদায়ুনে তাঁর মাজার আজও সবার যিয়ারতগাহ হয়ে রয়েছে।

৬৩৬ হিজরি।

সফর মাসের সাতাশ তারিখ। এক সোনার সকালে তিনি মুখ দেখলেন এই কর্কশ পৃথিবীর।

দিনে দিনে বেড়ে ওঠে পূর্ণিমার চাঁদের মতো শিশু। দিন যায়। মাস যায়। দেখতে দেখতে পাঁচ বছরে পা দিলেন সুলতানুল আউলিয়া। কিন্তু এই পাঁচ বছরের বালকের মাঝে আলাদা সব গুণ দেখা গেল। তাঁর আচার ব্যবহার পরিণত মানুষের মতো। স্থির, ভাবগম্ভীর। কথা জ্ঞানগর্ভ। আদব কায়দা বহু চর্চার ফসল যেন। দু'মিনিট তাঁর সাথে থাকলে অবাক হয়ে যায় মানুষ। অদ্ভুত! অপূর্ব!

ঠিক তখনি আউলিয়ার জীবন আকাশে নেমে এলো মেঘের ছায়া। আচমকাই মারা গেলেন তাঁর পিতা। এতিম হয়ে গেলেন তিনি। দু'হাত দিয়ে আগলে ধরলেন স্নেহময়ী, খোদাভক্ত মা। দিশেহারা হলেন না তিনি স্বামীকে হারিয়ে। ছেলের ভবিষ্যত রচনার কাজে হাত দিলেন। সুদৃঢ় পদক্ষেপ। মকতবে পাঠিয়ে দিলেন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে। সেখানে কোরআন খতম দিলেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি। এবার ফিকাহার কিতাব কুদুরী পড়া শেষ করলেন। ফজিলতের সনদ দেবার সময় এলো। সে সময় অনেক ওলামা ও মাশায়েখে কেরাম বললেন, 'এই অলৌকিক বালকের মাথা কোন সৃষ্টির কাছে নত হবে না।'

সে সময় দিল্লীই ছিল জ্ঞান ও জ্ঞানীগুণীদের প্রাণকেন্দ্র।

মাওলানা শামসুদ্দিন দামগানী খুবই উঁচু স্তরের আলিম। তিনি ছিলেন দিল্লী শহরের নাম করা ওস্তাদ। বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দিন বলবনও তাঁর ইলম ও সিদ্ধির মর্যাদা দান করতেন। তিনি অধ্যাপনার কাজ করতেন। নিযামুদ্দিন আওলিয়ার বয়স তখন ষোলো। তিনি হাজির হলেন মাওলানা শামসুদ্দিনের দরবারে। পলক তুলতেই চিনে ফেললেন ওস্তাদ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রটিকে। তিনি তাঁকে নিজ হুজরায় ঠাঁই দিলেন।

মাওলানা সাহেব তাঁর কোনো ছাত্র পড়াতে না এলে ঠাট্টা করে বলতেন, 'আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি? কাল যে এলে না?'

ছাত্র নির্বাক।

'আমার অপরাধ বলো। সে অপরাধ আমি আবার করবো। তাহলে কাল তুমি পড়তে না আসার সুযোগ পাবে।'

কিন্তু নিযামুদ্দিন না এলে মাওলানা ঠাট্টা না করে একটি ফারসী বয়াত পড়তেন। এর মাঝে একদিন আওলিয়ার মা এই দুনিয়া ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। আর হারানো বাবা মা'র ভালবাসা নিয়ে নিযামুদ্দিনকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন জামানার বুজুর্গ ফরিদউদ্দিন গাঞ্জশকর। তাঁর ছোট ভাই শেখ নাজিবউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে আওলিয়ার সখ্যতা খুব গভীর হলো। একদিন নিযামুদ্দিন তাঁর খেদমতে আরজ করলেন, 'দোয়া করেন যেন আল্লাহ্ পাক আমাকে কোন জায়গায় কাযীর পদ দান করেন। তাহলে আল্লাহর বান্দাদের উপকার হবে।'

শেখ নাজিবউদ্দিন চুপ।

আওলিয়া ফের অনুরোধ জানালেন।

'তুমি কখনো কাযী হবে না।' এবার উত্তর দিলেন নাজিবউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি, 'তুমি কি হবে তা আমি জানি!'

একদিন সুব্হি সাদিক।

মসজিদের মিনার থেকে আজান শেষে ভেসে এলো কালামে পাকের আয়াত। তার অর্থ- 'যারা ঈমান এনেছে এখনো কি তাঁদের মন আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ার সময় আসেনি।' এই আয়াত শুনে ব্যাকুল হলেন নিযামুদ্দিন। তিনি তাঁর পীর ফরিদউদ্দিন গাঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির আবাস অজুধনের পথে যাত্রা করলেন।

ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি চিৎকার করে উঠলেন নিযামুদ্দিনকে দেখা মাত্রই।

'আয় আ-তেশে ফিরাকাৎ দিলাহা কাবাব কার্দাহ। সায়লাবে ইশতিয়াকাত্ জান্হা খারাব কার্দাহ।'

'হে প্রিয়, তোমার বিচ্ছেদের আগুন অন্তরকে পুড়িয়ে ফেলেছে। তোমার প্রেমের বন্যাধারায় প্রাণ আজ বিরাণ।'

বলতে বলতে চোখের পানি মুছলেন। ফের চোখ ভরে পানি এলো। তিনি আর পানি মুছলেন না। কপোল উপচে পানি পড়ছে অজুধনের বালি মাটিতে। তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। নিজের চারতর্ফি টুপি খুলে পরিয়ে দিলেন আওলিয়ার মাথায়। বুকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। নিযামুদ্দিনের চোখের পানিতে বুক ভেসে গেল ফরিদউদ্দিনের। ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির চোখের পানিতে টুপি ভিজে গেল নিযামুদ্দিনের। তিনি এই তরুণকে ঘরে নিয়ে এলেন। নিজের 'খাস খিরকা' আর কাঠের খড়ম জোড়া দান করলেন। বললেন, 'হিন্দুস্থানের বেলায়েত আর আমার সাজ্জাদরূপ নিয়ামত আমি অন্য একজনকে দান করতে চেয়েছিলাম। তখন তুমি পথে। আসমান থেকে আওয়াজ এলো, "দাঁড়াও! নিযামুদ্দিন বাদায়ুনী, আসছে। এই বেলায়েত আর নেয়ামত সে পাবে"।'

ভাবাবেগে নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি নির্বাক।

কিছু বলতে চান। পারেন না। অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রবল বন্যা। কিন্তু তা মুখ ফুটে প্রকাশ পায় না।

সবই বোঝেন ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

তিনি বললেন, 'যা বোঝাতে আর প্রকাশ করতে চাইছো তার চেয়ে তোমার মনের রুদ্ধ অবস্থার দাম অনেক বেশি।'

দর দর করে চোখ ফেটে পানি এলো নিযামুদ্দিনের। তিনি কাঁপছেন। একটু একটু।

নিদারুণ কষ্টের মাঝ দিয়ে সাধকরা লাভ করেন মোক্ষ বা সফলতা।

ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে শুরু হলো সেই সাধনা। প্রায়ই দিন অনাহারে কাটতো তাঁদের। সে সময় মাওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক আর জামালুদ্দিন হাঁসুভী রহমতুল্লাহি আলাইহির মতো বুযুর্গরাও এখানে তালিম আর তরবিয়াত নিচ্ছেন। মাওলানা বদরুদ্দিন লঙ্গরখানার জন্যে বন থেকে কাঠ কেটে আনতেন। শেখ জামালুদ্দিন আনতেন বুনো ফল। লবণ আর সিরকা মিশিয়ে আচার তৈরি করতেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি। হুসামুদ্দিন কাবুলি রহমতুল্লাহি আলাইহির ওপর ভার ছিল পানি আনার। থালা বাসন মাজা, তরকারি কোটা আর রান্না করার কাজ ছিল নিযামুদ্দিন আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির ওপর।

প্রচণ্ড অভাব।

লবণ কেনার পয়সা নেই। ঘরের কাছেই মুদি দোকান। নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি খাদেম। উপায় না দেখে ধারে লবণ কিনলেন। খেতে বসেছেন। সুন্নত তরিকায়। একসাথে। পীর ও মুরিদ। ফরিদউদ্দিন, মাওলানা বদরুদ্দিন, মাওলানা জামালউদ্দিন হাঁসুভী আর নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি একই পাতে খাচ্ছেন। হযরত ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি লোকমা ওঠাতে হাত রাখলেন। তাঁর হাত খুব ভারি মনে হলো। 'অযথা খরচের গন্ধ পাচ্ছি!' তিনি বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন। 'নিজের নফসের তাঁবেদারী করতে গিয়ে কারো কাছে ধার নেয়ার চেয়ে দরবেশের মরে যাওয়া ভালো!' তার কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়লো।

কথা ক'টা বললেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির দিকে অপলকে চেয়ে থেকে।

'তরকারি গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দাও।' তাঁর শেষ কথা।

নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বসে আছেন ঘুমন্ত পীরের পাশে। মাছি তাড়াচ্ছেন। আচমকা জেগে উঠলেন। বললেন, 'দরবেশরা কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'কাছে এসো।'

তিনি কাছে গেলেন।

'তুমি দিল্লী যাও। সাধনায় নেমে পড়ো। এখানে থাকা বেকার। মনে রেখো, আধ্যাত্মিক উত্তরণের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে নামাজ আর রোযা। প্রথমে ফরয তারপর নফল।'

বিদায়ের ঘন্টা বাজলো।

ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'নিযাম, তুমি হিন্দুস্থানের জন্যে। আল্লাহ তোমাকে ইল্‌ম, বুদ্ধি আর ইশ্‌ক দান করেছেন। ধার নিও না। নিলে তাড়াতাড়ি শোধ করে দিও। দুশমনকে খুশি রেখো। তাদের কষ্ট দিও না। তারা যেন তোমার উপর নারাজ না হয়।'

সে সময় অনেক বুজুর্গ ছিলেন।

ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির মাথায় ছিল কুতুবউদ্দিন কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির পাগড়ি। তিনি সেটা নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির মাথায় পরিয়ে দিলেন। বাড়িয়ে ধরলেন তাঁর লাঠি। পরালেন খেরকা। বললেন, 'দু'রাকাত নামাজ পড়ো।'

সুলতানুল আরিফিন দিল্লী এসে তাদের সাথে মিলিত হলেন যারা তাঁর ওপর নারাজ ছিল। সবাই খুশি হলো। কিছু কাপড় ধারে নিয়েছিলেন। সামান্য টাকা তাঁর কাছে ছিল। সেটা দিয়ে বাকীটুকু পরে দেবেন ওয়াদা করলেন। দোকানী বাকিটা মাফ করে দিলেন।

রিয়াযত ও মুজাহাদায় নেমে পড়লেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

বেশি কান্নাকাটির ফলে তাঁর গালে যখমের মতো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এসময় তিনি শহর থেকে দূরে যমুনার তীর গিয়াসপুরে চলে এলেন। নানান দুঃখ কষ্ট তাঁর ওপর চেপে বসলো। একটানা ক'দিন ধরে না খেয়ে থাকতে হতো। খরবুযার মৌসুম এলো। বেশ সস্তা। কিন্তু কপালে জুটলো না। মৌসুম শেষ হলে একদিন একজন রুটি আর ক'টি খরবুজা নিয়ে এলো। তিনি আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে খেলেন। দু'টো রুটির আটা কেনার পয়সা ছিল না। এমন করে তিন দিন না খেয়ে ছিলেন একবার। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুললেন। একজন লোক দাঁড়িয়ে। অচেনা হাতে ভুনা খিচুড়ি ভরা পাত্র। সৌরভ ছড়াচ্ছে। তিনি নিলেন।

আগন্তুক অদৃশ্য হলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই। পরে বার বার তিনি ওই খিচুড়ির মধুর স্বাদের কথা বলতেন।

অভাবের খবর পেয়ে সুলতান জালালউদ্দিন খিলজী ক'টা গ্রাম নজরানা হিসেবে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি কারো কাছে বন্দি থাকতে চাই না।'

একবার চার দিন পর্যন্ত আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে অনাহার চলছিল। পাশেই একজন নেককার মেয়ে বাস করতেন। তিনি আটা পাঠালেন। শেখ কামালুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ওই আটা মাটির পাত্রে রেখে চুলোয় চড়িয়ে দিলেন। এমন সময় দরজায় দরবেশ। খেতে চাইল। নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তৈরি খাবার তাকে দিলেন। গরম খাবার। মাত্র চুলো থেকে নামানো হয়েছে। অল্প কয়েক লোকমায় দরবেশ তা খেয়ে নিলেন। তারপর পাতিলটাকে আছাড় মারলেন। টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ভাঙা অংশ।

'ফরিদ তোমাকে গোপন নেয়ামত দিয়েছেন , আর আমি তোমার ক্ষুধা কেড়ে নিলাম।'

কথা কটা বলেই চোখের পলকে অদৃশ্য হলেন দরবেশ।

শুরু হলো স্বচ্ছলতার যুগ।

মুরিদানে ভরে গেল বন। আর আশা আর আলো। দিকে দিকে সাড়া পড়লো। আসতে লাগলো অঢেল খাবার আর নানান উপহার। যেন ধন দৌলতের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বনের এই পর্ণ কুটিরের সামনে। চললো মেহমানদারী। সারাদিন সারারাত জ্বলছে লঙ্গরখানার চুলো। তৈরি হচ্ছে খাবার। খাচ্ছে অগণিত মেহমান।

একদিন।

একজন ধনী একশো সোনার মুদ্রা আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে পেশ করলো। তিনি তা নিলেন না। মুখ কালো হয়ে গেল ধনী লোকটার। সে ফিরে যাচ্ছে। ব্যথিত। তার পা পড়ছে ধীরে। লোকটা কষ্ট পাচ্ছে। এটা গোনাহ। তাই তিনি তাকে ডাকলেন। নিযামুদ্দিন হাত বাড়ালেন তার থলির দিকে। তুলে নিলেন একটা সোনার মুদ্রা। আবার মন খারাপ হলো ধনীর। সে বসে পড়লো। সামনে পড়ে আছে থলে। সোনার! অবহেলায়। অনেকক্ষণ বসে রইলো ধনী। অস্বস্তিকর নীরবতা। সে ভাবছে, হুজুর কেন কবুল করছেন না। তবে কি এগুলো হারাম কামাই?

'হারাম নয়,' নিরবতা ভাঙলেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি । 'এগুলো তুমি নিয়ে যাও। তুমি অভাবী। তোমার কাজে লাগবে। আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি আঙ্গুল তুলে নিজের পেছনে ইশারা করলেন, 'ওদিকে তাকাও।' ধনী তাকালেন। বিস্ময়ে বড় বড় হলো তার চোখ। দেখছেন। নিষ্পলকে। পাহাড় পরিমাণ সোনার মুদ্রা। শোভা পাচ্ছে। আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির পিছনে।

'এসব কথা কাউকে বলো না । এখন যাও।'

সে নির্দেশ মানতে পারলেন না ধনী লোকটি। চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন গোপন কথা।

লঙ্গরখানায় হাদিয়া আসার পরিমাণ বেড়ে গেল। বড় বড় ধনীদের আনাগোনা বাড়লো। একদিন এলেন আমির খসরু। তিনি কবি। হুজরার ভেতরে ঢুকলেন না। দরজার বাইরে বসে রচনা করলেন কবিতা।

"আপনি এমন একজন বাদশাহ যে আপনার বাড়ির দেয়ালে একটা কবুতর এলে তা ফয়েজের বরকতে বাজপাখি হয়ে যায়। একজন গরীব এসেছে আপনার দ্বারে সে কি করবে? ভেতরে ঢুকবে না ফিরে যাবে?"

কবিতা লেখা শেষ। দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির খাদেম।

'দরজার বাইরে একজন তুর্কী যুবরাজ বসে আছে।' তিনি বললেন, 'তার কাছে আওলিয়ার লেখা কবিতা পড়তে বলা হয়েছে।'

আনন্দে চোখে পানি এলো খসরুর। তিনি বললেন, 'শোনাও সে কবিতা।'

তিনি শোনালেন।

'সত্য জগতের মানুষ ভেতরে চলে এসো।
তার সাথে আমার আছে রহস্য আলাপ,
যদি সে অচেনা হয় বোকা,
ফিরে চলে যাক, করুক বিলাপ।'

আমীর খসরু ভেতরে ঢুকে আবেগঘন কদমবুসি করলেন সুলতানুল আরেফিনকে।

একদিন।

দরগাহে এলো এক দরবেশ। তিনি কিছু খেতে চান। কিন্তু দুর্ভাগ্য। সেদিন হাদিয়া আসেনি। লঙ্গরখানা শূন্য। নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে পরদিন আসতে বললেন। এলো। এদিনও কোনো খাবারের ব্যবস্থা নেই। লজ্জিত নিযামুদ্দিন। তিনি আজ আর দরবেশকে ফেরালেন না। নিজের জুতো জোড়া দিয়ে দিলেন।

পথে দেখা হলো আমির খসরুর সাথে। খসরু বাদশাহর সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি দরবেশকে দেখেই বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আমার মুরশিদের কাছ থেকে আসছ?'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'তোমার গায়ে মুরশিদের খুশ্‌বু!'

দরবেশ জুতো দেখালেন। খসরুর কাছে ছিল পাঁচ লাখ রুপোর মুদ্রা। তিনি সব দিয়ে কিনে নিলেন জুতো। বললেন, 'টাকা না থাকলে জীবন দিয়ে কিনে নিতাম।'

বাদশা আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির ভক্ত। দরবারে বাদশা নিজেই আসতেন। আওলিয়া বাদশার দরবারে যাওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু বাদশা নিজেই যেচে পড়ে ভাব রাখতেন। আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি তার জন্য দোয়া করতেন।

চেঙ্গিস খাঁ দুনিয়া জয় করে দুর্বার গতিতে ঢুকে পড়লো ভারতবর্ষে। দিল্লীর ভেতরে তখন বাদশার কোনো সৈন্য ছিল না। চেঙ্গিস দিল্লী অবরোধ করলো। বাদশা ছুটলেন দরবেশের দরগাহে। তিনি হাত তুললেন। চেঙ্গিস পরাভূত হয়ে পালালো।

কারণ?

অদ্ভুত এক ভয় তাদের চেতনাকে অবশ করেছিল।

নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির নাম ডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন দিল্লীর সিংহাসনে চড়লেন কুতুবদ্দিন মুবারক শাহ্। আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির সুনাম তাঁর সহ্য হলো না। হিংসুক বাদশাহ তার হিংসা মেটালো। হত্যা করলো আওলিয়ার এক খাস ভক্ত সুলতান আলাউদ্দিনের ছেলে খেজের খাঁকে। নানা রকম কষ্ট, যন্ত্রণা, অবিচার আর অত্যাচার শুরু করলো।

কাজী গজনবী ছিল বাদশার খাস মন্ত্রী। তাকে একদিন বাদশা জিজ্ঞেস করলো, 'কাজী সাহেব, শুনলাম নিযামুদ্দিন আওলিয়ার লঙ্গরখানায় রোজ দু'হাজার সোনার মুদ্রা খরচ হয়। আসে কোত্থেকে?'

কাজীও নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি কে মনে মনে হিংসা করতো। তাড়াতাড়ি বললো, 'আপনার লোকেরা তাঁর পেছনে টাকা লোটাচ্ছে।'

শুনে বাদশা ঘোষণা দিল, 'আমীর, ওমরা, রাজ কর্মচারী কেউ যেন আওলিয়ার দরবারে না যায়। গেলে তার চাকরি নষ্ট হবে। সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হবে। কোনো শাহজাদা সেখানে গেলে তার ভাতা হবে বন্ধ।'

সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল আমীর ওমরাদের যাতায়াত। সাথে হাদিয়া। শুনে খাজা ইকবালকে ডাকলেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি। সে লঙ্গরখানা চালাতো। বললেন, 'ইকবাল, আজ থেকে লঙ্গরখানার খরচ দু'গুণ বাড়িয়ে দাও।'

'টাকা?' দ্বিধা ও ভয় নিয়ে বললো ইকবাল।

'ওখানে হাত দাও।' একটা তাক দেখিয়ে বললেন আওলিয়া। ইকবাল হাত ওঠালেন।

'বিসমিল্লাহ্ বলো।'

ইকবাল তাই করলেন।

থোকা টাকা হাতে উঠে এলো।

বাদশার গুপ্তচর ছিল তক্কে তক্কে। খবর পেল বাদশা। দরগাহ চলছে। আরো আড়ম্বরে। ঘটনা কি? লোক লাগালো। আসল খবর প্রচার হলো। বাদশা লজ্জায় অপমানে মাথা নত করলো।

এবার বাদশা লোক পাঠালো। চিঠি নিয়ে। তাতে লেখা, 'হযরত শেখ রোকনুদ্দিন বছরে একবার এসে আমার সাথে দেখা করেন। আপনি দিল্লীতে থেকেও কেন আসেন না?'

চিঠির জবাবে আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখলেন, 'রাজা বাদশাদের সাথে দেখা করা আমার রীতি নয়।'

বাদশা তখনই খবর পাঠালো, 'আমার আদেশ আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে।'

এই বাদশার পীর হচ্ছেন হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন রুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর কাছে চিঠি পাঠালেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

'আপনি বাদশাকে নির্দেশ দিন যেন তিনি ফকির দরবেশদের বিরক্ত না করেন।'

চিঠি নিয়ে খাদেম রওনা হলো। পৌঁছে দেখলেন রুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি পরপারে চলে গেছেন। তাঁর ফাতিহায় হাজির হলেন দেশের সবধরনের আলিম, আওলিয়া আর দরবেশ। বাদশাও আছেন। নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহিকে দেখে সবাই সম্মান করে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়াল না বাদশা। সে কোরান শরীফ পড়ছে। এমন ভাব দেখালো। সে চাচ্ছে নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে সালাম করুক। নিযামুদ্দিন তা করলেন না। লোকজন তাঁকে সভয়ে সালাম দিতে ইশারা করলো। তিনি বললেন, 'তেলাওয়াতের সময় সালাম ঠিক নয়।'

বাদশা আরো খেপলো।

দেশের সব আলেম দরবেশদের ডাকলো। বললো, 'আপনারা আওলিয়াকে বলুন, তিনি যেন সপ্তাহে একবার, না পারলে মাসে একবার, না পারলে বছরে একবার আমার সাথে দেখা করেন। তিনি কী জবাব দেন আমাকে জানান।'

আলেমরা এলেন তাঁর দরবারে। সবাই অনুরোধ জানালো। তাঁরা বললেন, 'বাদশাকে খেপানো তাঁর ঠিক হবে না।'

তিনি চুপ। মাথা নিচু। খানিক পরে মাথা উঁচু করে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।'

চমকে উঠলেন আওলিয়ার খাস ভক্তরা। 'বলেন কি, হুজুর? এতদিনের জ্বালিয়ে রাখা প্রদীপ নিভে যাবে এক ফুঁয়ে!'

আওলিয়া যাবেন বাদশার কাছে!

এও কি সম্ভব?

'সফর মাসের উনত্রিশ তারিখে আমি যাবো বাদশাহর দরবারে, ইনশাআল্লাহ্।' উঁচু স্বরে বললেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

সেদিন।

সফর মাসের উনত্রিশ তারিখ।

বাদশা অপেক্ষায়। দরবেশ আসবে তার রাজপ্রাসাদে। এই পরাজয় তার জন্যে বিরাট ব্যাপার। দরবেশ যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় তার সাথে পেরে উঠলো না এটা প্রমাণ হতে চলেছে।

সাঁঝের বেলা।

হাজির হলো শেখ ওয়াজিহুদ্দিন কুরাঈশী আর আমির খসরুর ভাই আইজুদ্দিন। 'শুনলাম, হুজুর আপনি যাচ্ছেন রাজপ্রাসাদে?' তারা শুধালো।

'নিশ্চয়ই। ওয়াদা করেছি, যাবো। ইন্‌শাআল্লাহ।'

'এটা কি আপনার নীতির পরাজয় নয়, হুজুর?'

'জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে।' বলে চোখ বুজলেন আউলিয়া। থমথমে হয়ে গেছে তাঁর চেহারা।

কবরের নিরবতা নামলো। ওরা ফিরে গেলেন।

মনে ভয়। কি জানি কি হয়।

আরো রাতে।

খাজা ইকবাল এলো।

'হুজুর, বাদশার দরবারে তাবারুক হিসেবে কি নেবেন?' তার প্রশ্ন।

আউলিয়া চুপ।

ইকবাল তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি চুপ

রাত বাড়ছে।

বাড়ছে উৎকণ্ঠা।

দুপুর রাত।

আওলিয়া না আসাতে খুব বিরক্ত বাদশা।

একটা বড় ধরণের প্রতিশোধের পরিকল্পনা রচনা করে ঘুমুতে গেল নিজ বিছানায়।

তলিয়ে গেছে বাদশা। গভীর ঘুম।

পা ফেলে এগুলো কালো ছায়ামূর্তি।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর চোখ টকটকে লাল। লাঠি হাতে এলেন কুটিরের বাইরে। দমকা হাওয়ার বেগে। ভক্তদের ডাকলেন। 'এসো, এখন আমরা বাদশার দরবারে যাবো।'

'হুজুর!' সভয়ে বললো ইকবাল, 'এখন রাত দুপুর। বাদশা ঘুমুচ্ছে।'

'না।'

'না?'

'সে আজরাইল ফেরেশতার হাতে বন্দি।'

'মানে!'

'সে নেই।'

'কোথায়?'

'পরপারে।'

হুজুরের হেঁয়ালি কেউ বুঝতে পারছে না। অজানা ভয়ে ওদের বুক কাঁপছে। ঘটেছে নিশ্চই কোনও অঘটন।

হুজুর তখন রাজপথে। চলেছেন। দ্রুত পায়ে। পেছনে ওরা।

বাদশার রাজপ্রাসাদে আতঙ্ক। কান্নার রোল।

নিজ বিছানায় শুয়ে আছেন বাদশা! রক্তাক্ত! দরবেশের ভক্তরা দেখছে। নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাঁকে আততায়ী। ঘাতক।

সাদা কাপড় দিয়ে বাদশার আতঙ্কিত চেহারা ঢেকে দিলেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি। বললেন, 'আমি কথা রেখেছি। তোমার দরবারে এসেছি। আল্লাহ তোমার অশান্তি দূর করুন।'

সারারাত দরবেশ পাহারা দিলেন রাজার কাফন পরা লাশ।

ফজরের পর রাজ্যের সবাইকে নিয়ে পড়লেন জানাজা।

শামসুদ্দিন বাজ্‌জাজ নামে একজন ধনী লোক মনে মনে আওলিয়াকে ঘৃণা করতো। একদিন সবুজমন্ডী বলে এক জায়গায় সে মদ পান করার তোড়জোড় করছিল। হঠাৎ তাঁর সামনে যেন সুলতানুল আরিফিন এসে দাঁড়ালেন। ধমকের সুরে বললেন, 'সাবধান! মদ পান করিস না।'

বিদ্যুৎ খেলে গেল বাজ্‌জাজের হাতে। সে দ্রুত ছুঁড়ে ফেললো শারাবের বোতল। তারপর অপলকে চেয়ে থাকলো চুরমার হয়ে পড়ে থাকা বোতলের দিকে। ফুটে উঠলো চোখে মুখে আতঙ্ক। যেন সাপ দেখছে। জ্যান্ত।

তখনই সে দরবেশের দরবারে এসে ক্ষমা চেয়ে তাওবা করলো। ধরলো চির শান্তির পথ।

গিয়াসুদ্দিন মুহাম্মাদ তুঘলক তখন গিয়াসপুরের সুলতান। একদিন। দস্তরখানে বসে চলছে খাওয়া দাওয়া। রাজকর্মচারীরা খাচ্ছে তৃপ্তিভরে। উপাদেয় খাবার, সুপেয় পানি। হঠাৎ একজন সরবে বলে উঠলো, 'হায়! বনে দরবেশের পর্ণ কুটিরে একশো রকম খাবার আর রাজ দরবারে মাত্র দশ ধরনের!'

সুলতান এগিয়ে গেল। 'কি বললে তুমি?'

সৈনিক ভড়কে গেল।

'একটু আগে কি বলছিলে তুমি?' ধমকে উঠলো সুলতান। কথাটা ফের বিড় বিড় করে বলল সৈনিক।

'একথা কি সত্যি?' গর্জে উঠল গিয়াসুদ্দিন তুঘলক।

'সবাই একথা জানে।' কাঁপা স্বরে বলল সৈনিক।

'তোমরা সবাই জানো?' সবার উদ্দেশে বাদশার প্রশ্ন।

'জ্বী, হুজুর,' একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'সবাই জানে। শুধু আমরা নই। গোটা দেশের প্রকৃত বাদশা সেই।'

'কিভাবে?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল বাদশার।

'দেশের সবচেয়ে সম্মানিত জন তিনি।' আরেকজন বললো।

'গোটা দেশ তার বনের পর্ণ কুটিরে ঝুঁকে পড়েছে।' আরেকজন।

'তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় আপনার শাহী তাখ্‌ত ভেঙে যেতে পারে।' অন্য একজন বলল।

'কি?!' রাগে ফেটে পড়লো বাদশা। খানিকক্ষণ চুপ থাকলো কথাগুলোর ধাক্কা সামলানোর জন্যে। তারপর বললো, 'সৈনিকের একটা দল এখনি যাও। তাকে ধরে নিয়ে এসো।'

'সেটা সম্ভব নয়।' একজন সন্ত্রস্ত সুরে বলল।

'কেন?

'তাঁর ক্ষমতা আপনার চেয়ে বেশি।'

'বাদশার চেয়ে বেশি ক্ষমতা বনের ফকিরের!' রাগে সব রক্ত উঠে এলো সুলতানের মুখে।

'জ্বি। তিনি আসবেন না। তিনি আসতে না চাইলে কেউ তাকে আনতে পারবে না।'

'তার এত বড় ক্ষমতার উৎস কি?'

'তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। তিনি সাধনা করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন। তিনি আল্লাহর বন্ধু।' বাদশাহ থতমত খেয়ে গেল। তার রাজত্বে এত বড় ঘটনা! রেগে উঠতে গিয়েও পারছে না। খানিকটা ভয় পেয়েছে সে। অনেকটা নরম কণ্ঠে সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও। তাকে বোঝাও তোমাকে আর বনে থাকতে হবে না। আজ থেকে রাজদরবারে থাকবে। তার আর আমার দস্তরখান আজ থেকে এক। তিনি আমার অতিথি।'

সৈনিকের দল চলে এলো বনে। ভয়ে তাদের বুক কাঁপছে।

সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

'কি চাও?' জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বি...' আওলিয়ার চোখের সুতীব্র ছটা এসে পড়াতে ভয় পেয়েছে ওরা। 'আ...আ আমরা সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের দরবার থেকে এসেছি।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।'

'হুজুর, বাদশা নামদার আপনাকে রাজ দরবারে ডেকেছেন।'

'বাদশার কাছে আমার চাওয়ার কিছুই নেই।'

'তিনি অতিথি হিসেবে এখন থেকে আপনাকে রাজপ্রাসাদে রাখতে চান। আপনার আর তার দস্তরখান এক হোক এটাই চান।'

মুচকি হাসলেন আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি। বললেন, 'তার দরকার নেই। তবে তার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে যেন এখানে আসে।' বলে কুটিরে ঢুকে গেলেন আওলিয়া। সৈনিকরা বোবা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

খবর শুনে চিৎকার করে উঠলো তুঘলক। 'ওর গর্দান চাই। এখনি।'

কিন্তু তখনই বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। তাই ছোট ছেলেকে নিয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্যে ছুটলো। বড় ছেলেকে নিল না। কারণ সে আওলিয়ার শিষ্য।

কিছুদিন পর।

একদিন। সাঁঝের বেলা।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের বড় ছেলে ফিরোজ শাহ তুঘলক ভীরু পায়ে আওলিয়ার কুটিরে ঢুকলো। আত্তাহিয়্যাতুর ভঙ্গিমায় বসল। আওলিয়া চোখ খুললেন। তার চেহারায় খুশির ছোঁয়া।

'হুজুর!' কাঁপা স্বর। ফিরোজের।

'বলো।' আবার হাসলেন আওলিয়া।

'হুজুর, আমার আব্বা এসে পড়েছেন।'

'ভালো।'

'তিনি দিল্লীতে হাজির।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ, বাংলার বিদ্রোহ দমন করে বিজয়োল্লাস করছেন।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে কাছেই। এটা শেষ করেই আপনাকে বন্দি করবে। আপনাকে হত্যা করবে।'

'দিল্লী এখান থেকে কতদূর?' চোখ বুজে ফেলেছেন দরবেশ। জোব্বার পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে তাসবীহ। সেটা হাতে তুলে ওপর দিকে নিলেন।

'একদম কাছেই!' ভয়ার্ত স্বরে বললো ফিরোজ।

'দিল্লী হানুজ দূর আস্ত।' বিড় বিড় করলেন আওলিয়া। হাতের তাসবীহ ছড়া শূন্যে ফেরাচ্ছেন। 'ফিরোজ! দিল্লী হানুজ দূর আস্ত!'

'দিল্লী এখনো অনেক দূর। দিল্লী এখনো অনেক দূর।' বলতে বলতে দরবেশের কপালে ঘাম দেখা দিল।

তখন দিল্লী শহরে বইছে পৈশাচিক আনন্দের বান। বাঙলার বিদ্রোহ দমন হয়েছে। বিরাট বিজয়। বিশাল এক মন্ডপ সাজানো হয়েছে। ঘেরাও এর মাঝে নানা ধরনের প্রদীপ, হ্যাজাক, দীপাবলী। আলোয় ভরে আছে। রঙিন পানীয়ের নহর বয়ে যাচ্ছে।

বাদশা তার ছোট ছেলেকে নিয়ে হাতীর হাওদায় চড়ে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ কী হলো। কাঁপন লাগলো মন্ডপের ছাদে। চিড় ধরলো জায়গায় জায়গায়। বজ্রপাতের মতো শব্দ হলো। মন্ডপের ছাদ পড়লো ভেঙে। হুড়মুড় করে। বাদশার মাথার ওপর। প্রচন্ড চাপে হাতী যেন দাফন হয়ে গেল মাটিতে।

হই চই, ভয়ার্ত ছুটোছুটি, আর্তনাদ আর মৃত্যু চিৎকার।

চোখ খুললেন নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি। মুখে বিষণ্ন হাসি।

কপালের ঘাম মুছলেন।

পরিশ্রমে ক্লান্ত। ঘুমুবেন।

খবর পেয়ে ফিরোজ ছুটলো দিল্লী।

তার বাবার লাশ। চেনা যায় না। বুকে জড়ানো ছোট ছেলে।

তার শরীরও ক্ষত বিক্ষত।

পড়ে আছে দুইজন প্রতাপশালী।

জড়াজড়ি করে।

হাঁটু গেড়ে বসলো ফিরোজ। নির্বাক।

অনেক পরে। তার চোখ বেয়ে নেমে এলো দু'ফোঁটা পানি।

এ অশ্রু কীসের?

সে নিজেও জানে না।

সাতশো পঁচিশ সালে নিযামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি অসুখে পড়লেন। জ্ঞান হারাচ্ছেন যন্ত্রণায়। বার বার। ফিরলেই বলতেন, 'আমি কি নামাজ পড়েছি?'

'পড়েছেন।' শিষ্য বলতেন।

তিনি আবার সেই নামাজ পড়তেন।

শাহী চিকিৎসক এলো। তিনি চোখ মেলে বললেন, 'ইশকের ব্যথায় ব্যথিত মানুষের একটাই ওষুধ। মাশুকের দেখা পাওয়া।'

মৃত্যুর আগে প্রধান খলিফা শেখ নাসিরুদ্দিনকে খেরকা, মুসাল্লা আর তাসবীহ দিয়ে বললেন, 'তুমি দিল্লীতে থেকে লোকের জুলুম সইতে থাকো।'

সময় ঘনিয়ে এলো।

তিনি বললেন, 'তিনি এসেছেন । তাজিমের জন্যে আমাকে উঠিয়ে বসাও।'

তাঁকে ওঠানোর জন্যে ভক্তরা এগুলো। কিন্তু ততক্ষণে তিনি নিরব হয়ে গেছেন। এই শোকের দিনটি ছিল রবিউল আখের চাঁদের আঠারো তারিখ। সাতশো পঁচিশ সাল।

তাঁর পীর ভাই বলেন, 'আমি একদিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজারে তাওয়াজ্জুহ করে কবরের ধ্যানে বসলাম। দেখি আমার সামনে দিয়ে আলোর সমুদ্র। পাহাড় সমান ঢেউ। আমি দিশেহারা। দেখি, সেই আলোর সাগরে নূরের নৌকা। হীরে জওহর দিয়ে সাজানো আসন। তাতে বসে অপরূপ এক পুরুষ। সূর্যের চেয়ে আলোকিত তাঁর চেহারা। আমি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তাঁর কাছে গেলাম। শুধালাম, 'আপনি কে?'

'আমি নিযামুদ্দিন বাদায়ুনী।' তিনি বললেন।

'এতো আলো কীসের?'

'আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নূরের শিখা। এই নূর পাবার জন্যে প্রাণান্ত খাটুনি দাও।'



দুই

অনেক বছর চলে গেছে।

ভাবছে টাঙ্গাওয়ালা। কিন্তু এতোদিন পর আবার কি তিনি সজাগ হলেন। নইলে চারদিকে কীসের এতো সাড়া!

ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়লেন আবার।

আচমকা জেগে উঠলেন তিনি। ঝিমুচ্ছিলেন। খানিক আগেই। হঠাৎ কে যেন ভেতর থেকে ধাক্কা দিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে চোখ মেললেন। চোখের পলকে।

ঘটলো ঘটনাটা।

দুটো মানুষ।

আউলিয়ার মাজারের ভেতর থেকে ছুটে আসছিল শিকারির তাড়া খাওয়া পশুর মতো। বাতাসের বেগে।

চোখ কচলে নিলেন টাঙ্গাওয়ালা। দৃষ্টি বিস্ফারিত। চেয়ে দেখছেন দৃশ্যটি। এও কি সম্ভব?

একজন মোটা সোটা মানুষ। মাঝবয়েসী। তার বিশাল শরীর নিয়ে বাতাস কেটে ছুটে আসছেন।

হাঁস ফাঁস করছেন ভদ্রলোক। ঘেমে নেয়ে উঠছেন পরিশ্রমে। তার ফর্সা গোলগাল মুখের চামড়া ফেটে যেন রক্ত বেরিয়ে পড়বে। বড় বড় চোখে রাজ্যের বিরক্তি, অসহায়তা আর বিষাদের ছায়া। ছুটতে ছুটতে টাঙ্গার দরোজার সামনে আছড়ে পড়লেন। পাদানিতে পা রেখে একটু উঁচু হয়ে নিজেই ছিটকিনি খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। বসে দম নিলেন। মুহূর্তের জন্যে। তারপর চিৎকার করে উঠলেন - 'টাঙ্গাওয়ালা, জাল্‌দি চালাও-জাল্‌দি চালাও-'

বসেই রয়েছে টাঙ্গাওয়ালা। মর্মর মূর্তির মতো জমে গেছে সে।

আবার চিৎকার করে উঠলো শেঠজি, 'ক্যায়া হুয়া তেরা? জাল্‌দি চাল্।'

'কি হয়েছে তোর? তাড়াতাড়ি চালা।'

কিছুই কানে যাচ্ছে না টাঙ্গাওয়ালার। যতোই চিৎকার, চেঁচামেচি আর ধমক দিচ্ছে শেঠ।

টাঙ্গাওয়ালার দৃষ্টি মাজারের দীর্ঘ, বিশাল চত্বরে। সেখানে লোকজনের ভিড়। শেঠজির ফেলে আসা পথ ধরে ছুটে আসছে এক নারী। চারপাশের লোকজন হাল্কা পায়ে ছুটে আসছে তার দু'দিকে। তাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত। এমন দৃশ্য তারা আর দেখেনি। দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে মানুষ।

কারণ?

একটা সুতোও নেই তার গায়ে! কুড়ি বছরের তরুণী! নগ্ন! সম্পূর্ণ। তার চারপাশে এতো মানুষের ভিড় সে খেয়াল যেন তার নেই। আদুরে ভঙ্গিতে সে বলেছে, 'আব্বু-আব্বু-- মেরী আব্বু চালা যারাহা।' 'আব্বু-আব্বু- আমার আব্বু চলে যাচ্ছে।' যেন কৌতূহলী জনতাকে অনুরোধ জানাচ্ছে, 'আমার আব্বুকে একটু থামতে বলো। আমি এতো জোরে দৌড়তো পারছি না।'

লোকজন অবাক।

ছুটতে ছুটতে মেয়েটি পৌঁছে গেল টাঙ্গার কাছে।

এবার সচকিত হলো টাঙ্গাওয়ালা।

'আবে ওই টাঙ্গাওয়ালা! জাল্দি চালা-' রাগভরা কণ্ঠ ভেসে এলো শেঠজীর।

'আরে ওই টাঙ্গাওয়ালা, তাড়াতাড়ি চালাও...'

কে শোনে কার কথা?

টাঙ্গাওয়ালা চেয়ে আছেন। অবাক।

মেয়েটি ডাকছে, 'আব্বু-আব্বু-মুঝে লে যাও। মুঝে ছোড়ো মাত। (আব্বু-আব্বু- আমাকে নিয়ে যাও। ফেলে যেওনা।)

সে দমাদম ঘা মারছে টাঙ্গার দরজার গায়ে। খুলতে চেষ্টা করছে।

শেঠজী তার হাত ঠেলে নিচে ফেলে দিচ্ছে। চারপাশে কৌতূহলী জনতার ভিড়।

আসন ছেড়ে নেমে এলেন টাঙ্গাওয়ালা। তার ঝিমুনি ভাব কেটে গেছে। টান টান হয়ে গেছে শরীরের সমস্ত পেশী। চারপাশের শুনশান নিরবতা হঠাৎ যেন যাদুবলে সরব হয়ে উঠেছে।

পাদানিতে পা রেখে দরজায় চেপে ধরা শেঠজীর হাত ঝটকা দিয়ে সরালেন। তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে খুলে দিলেন ছিঠকিনি। দুড় দাড় করে ওপরে উঠে গেল তরুণী। ঝাঁপিয়ে পড়লো শেঠজীর বুকে।

লোকজন সরালেন টাঙ্গাওয়ালা। তারা দূরে সরে দাঁড়ালো। আসনে চড়ে খানিকটা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গেলেন তিনি টাঙ্গা। নেমে এলেন।

'কৌন্ হ্যায় ইয়ে?' (ইনি কে?) জিজ্ঞেস করলেন শেঠজীকে।

'কৌঈ নেহি।' (কেউ নয়) শেঠজীর বিরুক্তিভরা উত্তর।

'কৌঈ নেহি তো ইয়ে কিঁউ আব্বু আব্বু বোল্ রাহা।' (কেউ নয় তো আব্বু বলে ডাকছে কেন?)

'ইস্কো কৌন্ বাচ্চা বোলেগা? (একে কে সন্তান বলবে?)

'হুয়া ক্যায়া?' (কি হয়েছে?)

'দেখ্ রাহা নেহি?' (দেখতে পাচ্ছো না?)

'এ্যায়সা কিঁউ?' (এমন অবস্থা কেন?)

শেঠজী শোনালো এক রহস্যময় করুণ কাহিনী।

সাত বছর বয়স থেকে এই বাচ্চা আর পোশাক পরে না। তার ধারণা, সে এখনো শিশু। দুনিয়ার বড় বড় বিশেষজ্ঞ দেখানো হয়েছে। এমন কোনও নামকরা আধ্যাত্মিক সাধক আর মাজার নেই যেখানে যাওয়া হয়নি। কিন্তু সবই বিফলে গেছে। আমার একমাত্র কন্যাকে ফেলে যাচ্ছি আওলিয়ার মাজারে। সে সমাজের কাছে আমাকে অপমানিত করে রেখেছিল। আমি আর তাকে নিয়ে চলতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা সব শুনে। তারপর মাথা তুলে বললেন, 'দুনিয়ার সব জায়গায় তোমার যাওয়া হয়নি। দু'একটা জায়গা এখনও বাকী আছে।'

'বলো কি?'

'হ্যাঁ।'

'আর কোন্ জায়গা? আর কোন্ জন?'

'নিযামুদ্দিন বাঙলাওয়ালী মসজিদে তোমাকে নিয়ে যাবো।'

'সেখানে আবার কি?'

'সেখানে আছেন একজন মানুষ। মৌলভী সাহেব।'

করুণ হাসি ফুটলো শেঠজীর মুখে। 'দুনিয়ার এতো বড় বড় তাবড় আর জাঁদরেল সাধকদের কাছে গিয়ে বিফল হলাম।' ভাবছেন তিনি, 'আর এ কোথায় নিয়ে যাবে?'

'তু ফির কাঁহা লে যায়েগা।' (তুই আবার কোথায় নিয়ে যাবি?)

'আখির ইক জাগা।' (শেষ এক জায়গায়।)

'চাল্ (চলো)', বলে হেলান দিলেন ক্লান্ত শেঠজী।

তার বুকে মাথা রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি। সেও ক্লান্ত।

সে জানেনা কেন পিতা তার ওপর রাগ করে আছে। কেন রাস্তা আর

মাজারের লোকজন ভিড় করে তাকে দেখছিল। এসব জটিলতা থেকে হঠাৎই যেন মুক্ত হয়েছে সে। তাই ঘুমুচ্ছে।

বিস্মৃতিদায়িনী ঘুম।

ছুটে চলেছে টাঙ্গা।

বাঙলাওয়ালী মসজিদের দিকে। হাল্কা চালে। বিধ্বস্ত বুড়ো গতি ওঠাতে পারছেন না। কারণ তাঁর মন খারাপ। মেয়েটার একটা সুরাহা হবে তো? তাঁর চোখে ভাসছে সেই বিশাল পাগড়ি পরা মৌলভী সাহেবের ঝলমলে চেহারা। তার মন বলছে একমাত্র তিনিই পারবেন। অসীম রুহানী ক্ষমতার অধিকারী তিনি।

আচমকা ধাক্কা খেয়ে চমকে জেগে উঠলেন শেঠজী। তার ঘুম গেছে টুটে। তিনি চোখ কচলে নিলেন। পরিষ্কার হলো গাড়ির ভেতরটা। অবাক হলেন তিনি। আশ্চর্য! মেয়েটা তার বুকের ওপর থেকে সরে গেছে। গাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাথা নিচু করে নিজেকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। টেনে ছেড়ে দেয়া তানপুরার তারের মতে কাঁপছে সে। থর থর করে।

পাশে এলেন শেঠজী। 'ক্যায়া হুয়ারে তেরে, বেটি?' (কি হয়েছে তোমার, মা?)

'মেরি কাপ্‌ড়া কাঁহা?' (আমার পোশাক কোথায়?)

'কাপড়া? তু কাপ্‌ড়া পেনহেগি?' (কাপড়! তুই কাপড় পরবি?!)

হু হু করে কেঁদে ফেললো মেয়েটি। দু'হাতে মুখ ঢেকে। বাবা মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। কান্না থামলো। 'আব্বু, আমি কি সব সময় কাপড় ছাড়া থাকি?' কান্না জড়ানো স্বরে শুধালো মেয়ে।

'হ্যাঁ, মা। তুই সাত বছর বয়স থেকে আর কাপড় গায়ে জড়াস নি।'

'কেন, বাবা? আমার কি হয়েছে?'

'তা তো মা আমরা কেউ জানি না।'

মেয়ে মাথা নিচু করে আবার কেঁদে ফেললো।

কান্নার দমকে তার পিঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে। শেঠজী তার পিঠে হাত বুলাচ্ছেন। ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি জেগে আছেন, না কোনো স্বপ্ন

দেখছেন। একটা ঘোরের মতো তিনি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েই চলেছেন। মেয়েও কেঁদে চলেছে। এই মাত্র পেয়েছে সে বোধ। জেগেছে জীবনের সাড়া। সঠিক চেতনা। কোথায় ছিল সে এতদিন?

হঠাৎ বৃদ্ধের গায়ে এতো জোর এলো কোত্থেকে?

ঘোড়ার পায়ের খুরে এতো গতি এলো কোত্থেকে?

ঝড়ের গতি উঠেছে টাঙ্গায়। ছুটছে! উল্কা বেগে।

সে শব্দে তলিয়ে যাচ্ছে এক বেদনা বিধুরার নিরব কান্না।

শেঠজী নির্বাক। চারদিক নিঝুম।

শুধু একটানা শব্দ তুলছে ঘোড়ার খুর। খট্ খট্, খট্ খট্।

আচমকা হোঁচট খেল টাঙ্গা। পৌঁছেছে। বাঙলাওয়ালী মসজিদের সামনে। শুনশান। নিরবতা। প্রথম নামলেন টাঙ্গাওয়ালা প্রায় ঝাঁপিয়ে নামলেন শেঠজী। মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটি। টাঙ্গার ভেতর। হাঁস ফাঁস করে ছুটে এলো শেঠজী টাঙ্গাওয়ালার দিকে। কানের কাছে মুখ এনে উত্তেজিত ভাবে কিছু বললো। ছানাবড়া হয়ে গেল টাঙ্গাওয়ালার চোখ।

শেঠজী ছুটলো বাজারের দিকে।

টাঙ্গাওয়ালা পাহারা দিচ্ছে মেয়েটিকে।

বাজার থেকে শেঠজী এনেছে দামী পোশাক। তার একমাত্র কন্যার জন্যে। পনেরো বছর পর সে চেয়েছে পোষাক। দরকার পড়লে সূর্য ছিনিয়ে এনে দিতে পারে সে তার মেয়েকে। তেমন পয়সা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। গাড়ি থেকে নেমেই টাঙ্গায় বসা মেয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন পোশাক। মেয়ে সেটা ওখানে বসেই পরে নিল। খুশির বান ডাকলো শেঠজীর চেহারায়। সে বাজার থেকে এনেছে গাড়ি ভর্তি ফল, মিষ্টি-আরো অনেক কিছু। সেগুলো নিয়ে টাঙ্গাওয়ালাসহ ঢুকে পড়লো মসজিদের নিরব, ঠান্ডা ঘরে।

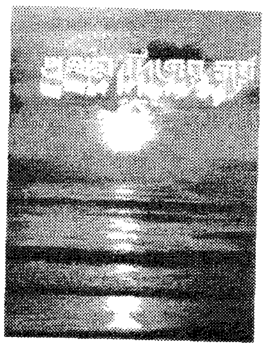
' তেরা বেটি ঠিক হো গ্যায়া?' মসজিদের মেঝেয় মিশে থাকা দীর্ণ শীর্ণ মানুষটি স্মিত হেসে শুধালেন। (তোমার মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে?)

দুনিয়ার সব সমুদ্রের পানি ঢল হয়ে নামলো শেঠজীর গাল বেয়ে। ধীর

পায়ে পাশে এসে বসলো। ভাঙা স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, হাযরাত! ঠিক হো গ্যায়া।' (হ্যাঁ, হুজুর! ঠিক হয়ে গেছে।')

অনেক নিরব লগ্ন। বয়ে যায়।

আর তেমন কথা হলো না। শেঠজী কেবল কাঁদলো। এক সময় বিদায় জানিয়ে চলে গেল।



তিন

কিন্তু টাঙ্গাওয়ালা যাচ্ছে না। মৌলভী সাহেব দেখলেন তাঁর সামনের মসজিদের শীতল মেঝে উষ্ণ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে শুধালেন, 'তেরা ক্যায়া হুয়া?' (তোর কি হয়েছে?)

বৃদ্ধ হঠাৎ কথা বলে উঠলেন।

সে কথা ছিল হাজার বছরের রুদ্ধ কান্না, বিলাপ আর মানুষের চেপে রাখা নিরব নিঃশ্বাসের। মানুষের জিজ্ঞাসার, ভালবাসার, প্রেমের, ব্যর্থতা আর যাবতীয় হতাশার। জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা অভিশপ্ত ইবলিসের হাতে বন্দি

মানুষের মুক্তির বাণী।

তিনি বললেন, 'আপ কুয়া বান্ কার বায়ঠা কিঁউ? বাদাল হোকে বারাস্ দিজিয়ে সারা দুনিয়াকো!' (আপনি কুয়ো হয়ে বসে আছেন কেন? বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দিন গোটা দুনিয়াকে!)

হঠাৎ কী হলো মৌলভী সাহেবের!

রুদ্ধ, গভীর বেদনা আর জমাট বিস্ময় থেকে উঠে আসা আত্মার আকুতি যেন তাঁর ভেতর প্রবল আলোড়ন তুলছে। বিস্ফোরণ ঘটছে চেতনার। বিরতিহীন তোলপাড় তুলছে মনের জমিন। চেতনার ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি মহাগর্জনে গর্জে উঠছে। শব্দগুলো যেন মসজিদের মেঝেয় গেঁথে দিল মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহিকে। কী বললেন এই প্রাচীন মানুষ! এতো প্রলয়, এতো তান্ডব, এতো বড় বিপ্লব, এতো বড় সৃষ্টির আর মুক্তির বীজ লুকিয়ে ছিল ওইটুকু শব্দে!

নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার থেকে এ কোন্ নূর নিয়ে এলেন টাঙ্গাওয়ালা?

একী হচ্ছে মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহির শরীর জুড়ে?

পলকে পলকে কোথায় চলেছেন তিনি? এ কোন্ অচেনা পৃথিবী? এ কোন্ নগরের পথ ধরে হাঁটছেন? এটা কোন্ মসজিদ? বায়তুল মুকাদ্দাস? কারা বের হচ্ছে জামাতবন্দি হয়ে? কোথায় চলেছেন এঁরা! এসব প্রাচীন মানুষের পরিচয় কি? এটা কোন্ যুগ?

কীসের আগুন জ্বলছে ওটা? এই কি সেই অনির্বাণ আগুন? তাহলে কি তিনি প্রাচীন পারস্যে এসে পড়েছেন? কীসের কান ফাটানো বিকট শব্দ হলো ওটা? আগুন নিভে গেল যে! তাহলে কী শেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চলে এসেছেন তিনি! এও কী সম্ভব!?

এ কোন্ আজান?

তবে কি সাইয়্যিদিনা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুঁর আজান? হ্যাঁ, তাইতো! সেই সুমধুর আজান। এ আহ্বান অবিশ্বাসীদের অন্তরে জ্বালায় দোজখের আগুন। অস্থির করে তোলে মুনাফিকদের। আর মুমিন নর-নারীর মনে আনে শান্তির অনাবিল ধারা। আসমানের বাসিন্দারা থাকে অপেক্ষায়। কখন শুনবে সে আজান। মহান রাব্বুল আলামিন সে সমুধুর ধ্বনি না শোনা পর্যন্ত সুব্হি সাদিক হবার হুকুম দেন না!

সমুদ্রের পর সমুদ্র। ছুটে চলেছে পাল তোলা নৌকা। নৌকার বহর। ওর মাঝে আজানুলম্বিত জুব্বা পরা ওঁরা কারা? দাওয়াতের কাজে দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে?

মরুভূমির পর মরুভূমি। উটের বহর। উত্তপ্ত বালুরাশির ওপর এসব এলোমেলো পায়ের চিহ্ন কাদের? কোথায় চলে গেছেন মহামানবেরা?

দেশ দেশান্তরে?

দূর থেকে দূরে।

পথ হতে পথে। পথে পথে কেন ঘুরে মরছেন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা? ঘর বাড়ি ছেড়ে?

লোকালয়ে লোকালয়ে।

বস্তিতে বস্তিতে, তাঁবুতে তাঁবুতে।

বৃক্ষের নিচে।

সমুদ্রের জলযানে, দুয়ারে দুয়ারে।

হেঁটে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে? উটের সাথী হয়ে?

ওঁরা হাত পা নেড়ে কী বোঝাচ্ছেন? কি শেখাচ্ছেন মসজিদের রহস্যময় আলো আঁধারিতে গোল হয়ে বসে? কীসের চর্চা চলছে?

ঢেউয়ের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে দৃশ্যগুলো। দ্রুত। শব্দহীন ভাবে। আলোময় ঝনঝন শব্দ কীসের!

তরবারি যুগের? প্রাচীন মানুষেরা মসজিদে এসে জমেছেন। "আস্‌সালাতু জামিয়া" বলার সাথে সাথে মৃত্যুর জন্যে ওরা তৈরি। চোখে মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ, ঐশ্বরিক দীপ্তি। আর মৃত্যুর পেয়ালা পান করার সুতীব্র কামনায় ঝক ঝক করছে চোখ। দৃপ্ত পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ওরা শান্তির বাণী শোনানোর জন্যে। যদি গ্রহণ করে তবে ভাই। নইলে দিতে হবে জিজিয়া আর অবাধে ধর্মপ্রচার করার স্বাধীনতা। যদি না মানে ঐশী শক্তিতে শক্তিমান অসীম ক্ষমতাধর সত্যের তরবারির সাথে ফায়সালা হবে মিথ্যার অস্ত্রের।

ছুটে চলেছেন প্রাজ্ঞ মাওলানা যুগের পর যুগে?!

মুসাইয়্যিব ইবনে ওমায়ির ঘরে বসে নেই। হিজরত করেছেন হাবসায়।

সেখানের অজ্ঞ মানুষকে দিচ্ছেন ইসলামের শিক্ষা। ওখান থেকে আবার হিজরত করছেন মদীনা মানোয়ারায়। সেখানেও দিনরাত কাজ করছেন। দাওয়াতের। তালীমের। ইবাদাতের। আর সেবার।

ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

পৃথিবীর পথে পথে ছুটে চলেছেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আজমাঈনগণ। আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু চলেছেন কন্‌স্টান্টিনোপলের পথে।

সাদ ইবনে আবি আক্কাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু চলেছেন পারস্যের কাদেসিয়ার পথে। দুর্ধর্ষ রোম ও পারস্যের সম্মিলিত তিনলক্ষ বাহিনীর সাথে লড়াই করছেন ছোট্ট সত্তর হাজারের বাহিনী। অস্ত্রের ভয়াবহ ঝনঝনানি। হাতী বাহিনীর পদভারে কেঁপে উঠছে নির্যাতিত পৃথিবীর কোমল মাটি। তাদের ক্ষিপ্ত বৃংহতি (ডাক), হ্রেষা রব, মৃত্যুকাতর আর্তনাদ, বিদ্যুৎগতি ছোটাছুটি আর হিংস্র উন্মত্ত তান্ডবে নীরব প্রকৃতি কাঁপছে। পিপীলিকার মতো মরছে মানুষ। লাশের পাহাড় জমে উঠেছে জায়গায় জায়গায়।

ওকি!

ও কার কান্নার আওয়াজ?

কে করুণ কণ্ঠে বলছে, 'আমার বন্দি দশা ঘোচাও। সত্যি স্বীকার করছি আমি লুকিয়ে মদ পান করেছি। সে অপরাধে আমাকে করেছ বন্দি। এখন আমি খিড়কি দিয়ে দেখছি মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্রে হেরে যাচ্ছে। দুশমন অদ্ভুত এক রণকৌশল নিয়েছে। তারা হাতিকে কালো পোশাক পরিয়েছে। তারপর সেগুলোকে মুসলমান বাহিনীর দিকে ছুটিয়ে দিয়েছে। এদের ঘোড়াগুলো এই অতিকায় প্রাণীদের বিশাল আকার আর ঝোড়ো গতি দেখে ভড়কে গিয়ে পিছু হটতে শুরু করেছে। যুদ্ধ ময়দানের নিয়ন্ত্রণ ছুটে গেছে মুসলমানদের হাত থেকে। তারা পালাচ্ছে। আমীর সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অসুস্থ। তিনি আফশোস ছাড়া আর কিছু করতে পারছেন না। এমন সময় পলায়নরত, পরাভূত মুসলমানদের জন্যে দরকার আমার মতো একজন যোদ্ধা! কে আমার জিঞ্জির খুলে দেবে? কে খুলে দেবে বন্ধ দরোজা?

কে দেবে আমাকে একটা সুতীক্ষ্ণ, ধারালো তরবারি আর দ্রুতগামী একটি

ঘোড়া?! আমি তাওবা করছি আর গোনাহ্ করবো না। মুসলমানদের পরাজয় আমার সহ্য হয় না।'

করুণ সুরে যুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন সেই বন্দি সাহাবী।

শুনে ছুটে গেছেন অধিনায়কের স্ত্রী। সাআদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে। সব ঘটনা খুলে বলছেন। সাআদ রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু এই চরম মুহূর্তে সাহাবীকে ছেড়ে দিতে বললেন।

একটু পরেই তিনি দেখলেন। জানালা দিয়ে। একজন যুবক! ঘোড়ার পিঠে! হাতে খাপ খোলা তরবারি। তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। মনে হলো যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ ছুটে গেল।

ভেসে এলো বজ্র চিৎকার।

'আমি আবু মাহ্জান সাক্বাফি, তায়েফের বিখ্যাত সাক্বীফ গোত্রের দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ যুবক। আজ সত্য আর মিথ্যার তরবারির শক্তি প্রমাণিত হবে।'

উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে গেল আবু মাহজানের ঘোড়া। ক্ষিপ্র গতিতে। বিদ্যুৎ ছুটছে। বাতাসে ঘোড়ার ক্ষুর থেকে উড়ছে ধূলো। শ'য়ে শ'য়ে লাশ পড়ে গেল শত্রুর। দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটে এলো আবু মাহজান। কচু কাটার মতো। অগণিত লাশ পড়ে রইলো দুশমনের।

থমকে গেল শত্রু। ভীত চকিত। মুসলমানের আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনি। কাঁপন ধরে গেল তাদের আত্মার। মুসলমানরাও অবাক হলো। আচমকা যুদ্ধের এই পট পরিবর্তনে।

আবার চিৎকার আবু মাহজানের-

'এসো দুশমনেরা! লড়াই করো আমার সাথে। আজ তোমাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেব। মুসলমান ভায়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ো আল্লাহর দুশমনের ওপর, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনের ওপর। মানবতার দুশমনের ওপর। আজ ওদের পরাজয় নিশ্চিত। সত্য প্রকাশিত হয়েছে, মিথ্যা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। এসো আমার সাথে। আমরা সত্যের পথিক। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

আঘাতের পর আঘাত।

আক্রমণের পর আক্রমণ। কাফিররা পালাচ্ছে। সভয়ে।

যুগের পর যুগ ধরে ছুটে চলেছেন প্রাজ্ঞ মাওলানা।

এটা কোন্ দৃশ্য!

উনি কে? সূর্যের চেয়ে আলোকিত চেহারা। ঝলমল করছে! কী নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) তাঁর সাথীদের? তবে কী এটা বদরের যুদ্ধের আগের রাত! তাইতো?

ওই তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করছেন, 'কে তোমার তৈরি আছো আগামী কালের এই অসম লড়াইয়ে শরীক হতে?'

'আমি তৈরি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!' ঝটিতি উঠে দাঁড়ালেন এক দীর্ঘকায়, সৌম্য পুরুষ। মানুষের এমন সমাহিত, প্রশান্ত চেহারা হয়? তবে কি ইনি সেই আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু?

'আগামিকালের যুদ্ধের জন্যে তোমরা কি তৈরি?' ফের শোনা গেল রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথিত কণ্ঠস্বর।

পর পর তিনবার উঠে দাঁড়ালেন। সিদ্দিকে আকবার?!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আহবান জানালেন। এবার দাঁড়ালেন পাথুরে চেহারার কঠিন এক পুরুষ। 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আমরা তৈরি।' বজ্র নির্ঘোষ তাঁর কণ্ঠস্বর।

তবে কি ইনি সেই লৌহমানব ওমর ফারুক রাদিয়ালাল্লাহুতায়ালা আনহু?

সেই বিশ্ববিশ্রুত দিগ্বিজয়ী খলিফা!

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁর নাম সভয়ে সশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় বার বার। শুধু মুসলমান নয়, ইহুদী, নাসারারাও যাঁর নাম উচ্চারণ করেন সম্ভ্রমের সাথে। সেই লৌহ মানব! যাঁর সম্পর্কে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পর যদি আর কেউ নবী হতো, তুমি হতে তা।'

বিস্ময়ে অবাক বিহ্বল চেয়ে আছেন মাওলানা এই অপূর্ব জীবন্ত দৃশ্যের দিকে।

এবার দাঁড়ালেন একজন আনসার সাহাবী।

মাওলানা তাঁকে ঠিক চিনতে পারলেন না।

'ইয়া রাসুলুল্লাহ! বুঝতে পেরেছি আপনি এই বদর প্রান্তরের নিঝুম রাতে কেন বার বার আমাদের জিজ্ঞেস করছেন তোমরা তৈরি কিনা।' তিনি সুমধুর করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আসলে আপনি আনসারদের মতামত জানতে চাইছেন। কারণ মদিনাতে আপনি আসার পর আমাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল যে যদি মদিনার ভেতরে কোনো শত্রুর আক্রমণ হয় তাহলে আমরা আপনার সাহায্য করবো, দলের সাথে মিলে যুদ্ধে করবো। কিন্তু আজ অনেক দূরে এসে এই ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ঘোড়া ও অস্ত্রছাড়া আপনার সাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো কিনা জানতে চাইছেন।' হঠাৎ ওই সাহাবীর কণ্ঠস্বর উঁচু কান্নাভরা আর বিষাদমাখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, ' হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যখন আজ থেকে অনেকগুলো বছর আগে মদিনায় এসেছিলেন তখন তো আপনাকে চিনতে পারিনি। তখনও আমরা জিব্রাঈল আমিনকে দেখিনি। দেখিনি আপনার মহত্ত্ব, মহানুভবতা আর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। দেখিনি আপনার থুতুতে মেশ্‌ক আম্বরের খুশবু। আপনার ঘামে কস্তুরীর সৌরভ। আপনার জন্যে মসজিদের কাঠকে কাঁদতে দেখিনি। দেখিনি চন্দ্র আপনার হুকুমে টুকরো হয়ে যায়। আজ তো হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যদি বলেন, পাহাড়ে চড়ে আগুনের সাগরে ঝাঁপ দিতে, আমরা তাই দিব। যদি বলেন, সুদূর হাদরামাউত পর্যন্ত এমন ক্ষুধা আর তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে যেতে তাই যাবো।'

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল হলো।

নিযামুদ্দিন বাঙলাওয়ালী মসজিদের মৌলভী সাহেবের কী হয়েছে? তিনি কোথায় কোথায় ভেসে চলেছেন?

একী!

ও কার আর্তনাদ?

মক্কার ঊষর মরুভূমি। দুপুরের খরতাপে যেন টগবগ করে ফুটছে। তাতে

উপুড় করে কাকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে? উনি কে? কার শরীরের রক্তে ভিজে যাচ্ছে মরুর বালি? কাঁকর? আর পাথর?

উমাইয়া ইবনে খালফের ঘরের কোণে বন্দি উনি কে?

কী কারণে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার?

কে উচ্চারণ করছে আহাদ--- আহাদ?

দড়াম করে আছড়ে পড়লো কার রক্তাক্ত দেহ? কার শরীরের চামড়ার রঙ হয়েছে লাল? ঠোঁট থেতলানো, সারা শরীরে ক্ষত, রক্ত মাখা কার এ জ্ঞানহীন পবিত্র দেহ?

কিন্তু ততক্ষণে তিনি আরেক জায়গায়।

কে? কার চিৎকার ওটা?

কে ওমন গর্বভরে, উঁচু স্বরে উচ্চারণ করলো পবিত্র শব্দাবলী?

'আশ্‌হাদু আল্‌ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ!'

এটা কি মসজিদুল হারাম? পবিত্র কাবা শরীফে উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই পবিত্র শব্দ এমন নির্জন দুপুরে কে ঘোষণা দিচ্ছেন?

মুহূর্তে ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেল। যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। কোত্থেকে সব মারমুখী মানুষেরা ছুটে এলো। ওরা কি কাফির? অবিশ্বাসী?

চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই উচ্চারণকারীর ওপর।

চললো কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড়ের বন্যা। আহত দেহ আছড়ে পড়লো মরুতে। কেউ চালালো লাথি। কেউ ছুঁড়লো পাথর আর ঢিল।

সেই জ্যোতির্ময় চেহারার মানুষটা রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর প্রাণ যায় যায়। একজন বয়স্ক দীর্ঘকায় মানুষ। তিনি কী সব বোঝালেন উত্তেজিত স্বরে। তারা থামলো।

আহত দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। তিনি মুছে দিচ্ছেন প্রিয় সাহাবীর রক্ত। চোখ তাঁর ভরা অশ্রুতে।

সে অশ্রু গড়িয়ে নামলো অঝোর ধারায়।

কিন্তু একী!

ওই একই লোক আবার দাঁড়িয়ে কাবা ঘরে।

সেই উচ্চারণ। ফের সেই নির্যাতন! আহ! আহ্!

শুধু কালিমা পড়ার কারণে এতো কিছু সইতে হচ্ছে! আহত রক্তাক্ত মানুষটাকে আবার একবার ভালো করে দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু---

পট পরিবর্তন হয়েছে ঘটনার---

সেই লৌহ মানব, কঠিন পাথুরে চেহারার দীর্ঘকায় মানুষটি। ঢোলা জুব্বার গায়ে বারোটা তালি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন তামাটে বর্ণের মানুষ। পাখির ঠোঁটের মতো তার নাক। বড় বড় চোখ। জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে সিজদার স্থান থেকে।

লোকজন ঘিরে গোল হয়ে বসে আছেন।

লৌহ মানব ডাকলেন তামাটে চেহারার মানুষটিকে। ইশারায়।

লজ্জিত ভঙ্গিতে পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর নগ্ন কোমর দেখা যাচ্ছে। চমকে উঠলো উপস্থিত সবাই। একী ভয়ংকর দৃশ্য! এমন কোমর আর কেউ কখনো দেখেনি। গোটা কোমর মাংসহীন। একটা কয়লার টুকরা যেন। কালো রঙের গর্ত হয়ে আছে। ভেতরের হাড় দেখা যাচ্ছে।

সবাই মাথা নিচু করলো।

দৃশ্য পাল্টেছে।

একই লোক। দেখা যাচ্ছে তাকে বাঁধা হয়েছে। রশি দিয়ে। দু' হাত ও দু'পা। হাতের দিকের রশি টানছে একদল লোক। পায়ের দিকের রশি টানছে আরেক দল। আর্ত চিৎকারে ভরে উঠছে বাতাস। নিচে জ্বলন্ত অঙ্গার। তার তাপে মানুষটার কোমরের চর্বি গলে পড়ছে। গল গল করে বেরুচ্ছে রক্ত। নিভে যাচ্ছে অঙ্গার।

পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ছে নিষ্ঠুর অত্যাচারী কাফিররা।

একী!

ইনি কে?

মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে পানিতে চুবাচ্ছে কাকে ওরা?

মুখে চিৎকার 'কালিমা ছাড় --- কালিমা ছাড়!'

মানুষটা কালিমা ছাড়ছে না। অত্যাচারও থামছে না।

কতদিন চলবে এ জুলুম?

নতুন দৃশ্য।

বারোজন পুরুষ কোথায় চলেছেন? সাথে বোরখা পরিহিতা পাঁচজন মহিলা মনে হয়? এই কাফেলা ঢুকলো এক নতুন রাজ্যে। পথে তাঁদের কত ভয়, কত বিপদ। হঠাৎ এদের চেহারায় খুশির ছোঁয়া দেখা দিল কেন? তবে কি কোনো সুসংবাদ শুনলেন? কে যেন এসে কী একটা খবর ছড়ালো তাতেই ওদের এই খুশি। মক্কার সব লোক মুসলমান হয়েছে। সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ছে। গুজবই বুঝি রটালো মানুষটা?

কাফেলা ফিরে চলেছে। মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে।

কিন্তু উপকণ্ঠে পৌঁছেই তাঁদের চেহারা কালো হয়ে গেল। মিথ্যা গুজব। মক্কার মানুষদের ওপর কাফিরদের অত্যাচার আরো বেড়ে চলেছে। খবর পেল ওরা। ফিরে চলেছে। কাফেলা।

সংখ্যায় এখন বেশি।

তিরাশিজন পুরুষ। আঠারোজন মহিলা।

বাদশার দরবার মনে হচ্ছে? নাজ্জাশীর নাম উচ্চরণ করলো কে যেন?

তবে কি এটা আবিসিনিয়ার হাবশা? কয়েকজন লোক উপহার নিয়ে ঢুকলো?

সিজদা করলো। এরা মনে হয় মক্কার হিংসুক কাফির?

বাদশা তাদের কথা শুনলেন। তাঁর মুখ থমথমে। এবার মুসলমান কাফেলার একজন যুবক দাঁড়ালেন। সুদর্শন। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কী যেন বোঝাতে চাইছেন।

বাদশার চোখে পানি।

তিনি পানি মুছলেন।

আরে!

এমন বুক ফাটা চিৎকার কোত্থেকে ভেসে আসছে?

মক্ক নগরীর আকাশ আর বাতাস ভারী। বন্দি জীবন যাপন করছেন একদল মানুষ। গিরি সঙ্কটে।

মাওলানার চোখ ফেটে পানি এলো।

তিনি সবই বুঝতে পারছেন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি কোথায় তলিয়ে যাচ্ছেন?

হঠাৎ রক্ত ছিটকে পড়লো কার পবিত্র দেহ থেকে? একটা কাটা মাথা রক্ত নিয়ে উড়ে পড়লো যেন পায়ের কাছে। নিষ্ঠুর, ভয়ংকর মুখ ভেসে উঠলো।

একে? রোম অধিপতি কায়সার নাকি?

সেই তো হত্যা করেছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো দূতকে। তাঁর চেহারায় বেদনার ছায়া।

পবিত্র আঙুল মুবারাক তুলে হুকুম দিচ্ছেন যুদ্ধ তৈরির।

একজন, দু'জন।

দশজন। কুড়ি। শত। হাজার। তিন হাজার মানুষ এক হলেন। সবার হাতে অস্ত্র। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর নম্র, ভদ্র একজন যুবকের হাতে তুলে দিলেন ইসলামের পতাকা।

ইনি কে?

ইনি কি জায়িদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু?

মুজাহিদদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। সম্মিলিত আওয়াজ। সে শব্দ যেন আসমানের বাসিন্দারাও শুনছে পরম আগ্রহে। আকাশে বাতাসে বেদনার রোল। একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে!

আবার শোনা যাচ্ছে অস্ত্রের ঝনঝনানি।

তিনহাজার মাইল দূরে থেকে সে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন মদিনার মসজিদে নববীতে বসে থাকা একদল সাহাবী রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুম আজমাঈন। তিনি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'ওই যে জাফর যুদ্ধ করছে! সে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! দুশমনও তাকে আক্রমণ করেছে! ওর হাত কাটা যাচ্ছে ---'

যুদ্ধের নির্মম ঘটনাগুলো দেখে বলছেন তিনি। হুবহু। এই সব নিষ্ঠুরতা দেখতে হচ্ছে সেই দরদীকে যিনি একজন মানুষের সামান্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। তিনি তাঁর চোখের সামনে তাঁরই সাথীর মৃত্যু দৃশ্য দেখছেন। দেখছেন কিভাবে তার সাথীর হাত কাটছে, পা কাটা যাচ্ছে!

ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। অবশেষে ঢলে পড়ছেন মৃত্যুর কোলে। তিনি বললেন, 'জাফর শহীদ হয়েছে! শোকের তীব্রতায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। নিজেকে কোন রকমে সংবরণ করতে চেষ্টা করলেন। চোখের পানি চেপে বললেন, 'জাফর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে।' তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'চোখ বেয়ে বেরিয়ে এলো অশ্রু। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুতায়ালার আনহু'র আপন ছোট ভাই জাফর। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। নিজ হাতে তিনি তাঁকে ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর দিকে। আপনজনের আর এতো ভালবাসার পাত্রের নির্মম, মর্মান্তিক হত্যাকান্ড দেখলেন নিজ চোখে। আসলে তো আগেই তিনি তা দেখেছিলেন। নইলে কিভাবে জামাত রওনা হবার সময় বললেন, 'জায়েদের হাতে থাকবে ঝান্ডা। সে যদি মারা যায় তাহলে জাফরের হাতে। জাফর যদি বিদায় নেয় তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা। সেও যদি তোমাদের ছেড়ে চলে যায় তাহলে পরামর্শ করে একজনকে অধিনায়ক তৈরি ক'রো।'

শুনে ইহুদী বলেছিল, 'এদের তিনজনের কেউ বাঁচবে না। নবীদের কথা এমনই হয়।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে থেকেই জানেন তাঁর সাথীদের মৃত্যুর খবর। আর এই সুতীব্র স্বজন হারানোর বেদনা লালন পালন করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর মনে কতই না কষ্ট হয়েছে।

এবার হাতে পতাকা তুলে নিয়েছেন জায়িদ ইবনি হারিসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। সব দেখতে পাচ্ছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মদিনার মসজিদে বসে। তিনি বললেন,' জায়িদ যুদ্ধ করছে! প্রবল বিক্রমে! ঝাঁক ঝাঁক শত্রু তাকে ঘিরে ফেলেছে! সে শহীদ হয়েছে!'

একজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এসে খবর দিলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! জাফরের ঘরে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বেদনায় নীল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'যাও, তাদের সান্ত্বনা দাও।'

সাহাবী চলে গেলেন।

ফিরে এলেন খানিক পরে। বললেন, ' হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জাফরের ঘরে বিলাপ আর বিরহের আর্তনাদ।'

'যাও তাদের সান্ত্বনা দাও,' ফের বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 'আজকের দিন তাদের জন্যে কেয়ামতের চেয়ে ভারী। বড় কঠিন দিন।' এবার আর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না। কেঁদে দিলেন। ঝর ঝর করে। কেঁদেই চলেছেন।

আবার ভেসে চললেন মাওলানা।

আরেক দৃশ্য।

বাশির ইবনে কারাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। ছোট সাহাবী। অল্প বয়সে হিজরত করে এলেন মদিনায়। এখানে আসার পরই ইন্তেকাল হয়ে গেল তাঁর মায়ের। একা হয়ে গেলেন বাশির। এই বাচ্চার আর কোনো আশ্রয় ছিল না। একমাত্র তার পিতা। কারাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। মা হারা এতিম ছেলেটাকে ফেলে যুদ্ধে শরীক হলেন কারাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই থাকলেন বাশির। অপেক্ষায় রইলেন। কবে বাবা ফিরে আসবেন। দূর হবে তাঁর একাকীত্ব।

দিন যায়।

একদিন শোনা গেল ফিরে এসেছে সেই দলটি। মদিনার উপকণ্ঠে। বাশির এই কথা শুনে ছুটে চলে এলেন বাইরে। এই মনে করে যে বাবাকে মসজিদে ঢোকার আগেই যদি স্বাগতম জানায় তাহলে বাবা খুশি হবেন। আর সেও বাবার চেহারা দেখে জুড়োবে বিরহ বেদনা। যে পথ দিয়ে দলটি ঢুকবে তার ধারে একটা টিলার ওপর বসে রইলেন তিনি।

ছোট ছেলেটা। বসে আছে। পিতার পথের পানে চেয়ে।

উদগ্রীব। কাফেলা ঢুকলো দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। বাশিরের অস্থির চোখ খুঁজছে পিতাকে। একজন, দু'জন, তিনজন করে সবাই চলে গেল একে একে। বাবাকে পাচ্ছেন না বাশির। কেঁপে উঠলো তাঁর অন্তর অজানা ভয়ে। দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এলেন তিনি। থমকে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ। অপলকে চেয়ে রইলেন ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়া দলটার দিকে। তার সারা শরীর কাঁপছে। পা রাখতে পারছেন না মাটিতে। ঢোক গিলছেন বার বার। কোথায় তার পিতা? নেই কেন দলটায়? উদগত কান্নাকে চেপে সে ছুটছে মদিনার দিকে। মনে আশা। হয়তো ভুল হয়েছে দেখার। কিন্তু চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘ ছায়া। তাকালেন চোখ তুলে। অবাক! তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

মুখোমুখি হলেন। বাশির। তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা অশ্রু। অনেকক্ষণ নির্বাক। প্রচন্ড শোকে, ভয়ে, দুঃখে ঝড়ে পড়া কবুতরের মতো কাঁপছেন তিনি।

একসময় কথা ফুটলো তার মুখে। কেঁপে উঠলো ঠোঁট। কাঁপা স্বরে শুধালেন

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা কোথায়? দলটিতে তাঁকে দেখছি না যে!'

হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করুণার আধার। সবচেয়ে কোমল অন্তর যাঁর। তিনি এমন নির্মম সত্যের কি উত্তর দেবেন? ভেবে পান না। বাচ্চার চোখে চোখ রাখতে পারেন না। মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। যেদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটা সেদিকে দ্রুত এসে আবার কান্না ভেজা স্বরে শুধালো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! মাআ দাফা আলা আবী?'

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা কই? তাকে কোথায় রেখে এলো?!'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। কপোল বেয়ে উপচে পড়লো অশ্রুধারা। 'ফাশ্‌তারাআ, ওয়া-কারাবা?'

তিনি কাঁদছেন। অঝোরে।

বাশির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'যখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদতে দেখলাম তখন সব বুঝে নিলাম। মুহূর্তেই পিতার না থাকার কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।'

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আজহাশ্‌তু বিল বুকা --!'

'হায়! আমি আজ আশ্রয়হীন। একা হয়ে গেলাম। মা ছিল না আজ বাবাকেও হারালাম।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'পা এগিয়ে কোলে তুলে নিলেন বালকটিকে। বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, 'না-না বাশির! তুমি অনাথও না আশ্রয়হীনও না।'

'ওয়ামা তারদা আন্ ইয়াকুনা রাসুলুল্লাহি আবাক, ওয়া-আয়িশাতা উম্মুক!'

'বাশির তুমি কি চাওনা আজ থেকে আল্লাহর রাসুল তোমার বাবা আর আয়িশা তোমার মা হোক?'

কেঁদে ফেললো বাশির।

বললো, 'আমি রাজী, হে আল্লাহর রাসুল। আমি রাজী!'

নতুন করে যেন আবার ঘটছে ঘটনাগুলো। জীবন্ত। স্পষ্ট।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে বিয়ে হয়েছিল হযরত আতিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে। সুন্দরী স্ত্রী। সুন্দর তার ভালবাসা। সেই ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়লেন আবদুল্লাহ। এমন ভাবে যে, ছেড়ে দিলেন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া।

আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁকে বোঝালেন। 'বাবা, বিবির প্রেমের বাঁধনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ো না যে দ্বীনের কাজ নষ্ট হয়। ক্ষতি হয়।'

লাভ হলো না। পরিস্থিতি যেমন ছিল তেমনি রইলো।

রাগ হলেন আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

বললেন, 'তুমি আমার ছেলে হয়ে কী করছো?'

তবুও সে বুঝলো না। তখন তিনি বললেন, 'যাও তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।' সব পিতার কথায় স্ত্রীর তালাক জায়েজ হয় না। আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এমনই এক পিতা যাঁর কথায় পুত্রের স্ত্রীর তালাক জায়েজ হয়ে যায়। দ্বীনের জন্যে ছেলের ঘরকে উজাড় করে দিলেন!

তালাক হয়ে গেল।

আবার শুরু হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া।

কিন্তু আতিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কথা ভুলতে পারলেন না।

একদিন। তুষার ঘন রাত। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। আবদুল্লাহর অন্তরে ব্যথার ঢেউ। আতিকাকে তাঁর মনে পড়ছে। তিনি আবৃত্তি করছেন --

'হে আতিকা, তোমাকে আমি কখনো ভুলতে পারবোনা। যতদিন দিন আর রাত হবে, যতদিন সূর্য চমকাবে, চাঁদ কিরণ দেবে– ততদিন তোমার স্মৃতি আমার মনে জেগে উঠবে।'

আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন ছেলের বিরহ ব্যথার কথা জানতে পারলেন তখন অস্থির হয়ে রুজু করে ফের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মহিমা!

আবদুল্লাহর মৃত্যু ঘরে হলো না। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর ছোঁড়া সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলা বুকে বিঁধে রক্তাক্ত করে দিল তাকে।

তিরিশ বছরের যুবক। সুদর্শন। আহত অবস্থায় মদিনায় নিয়ে এলো। রক্তাক্ত স্বামীর পাশে যুবতী স্ত্রী দাঁড়িয়ে। চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে। বিমূঢ়, রুদ্ধবাক, অশ্রুভেজা স্ত্রী'র চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে তাঁর যুবক স্বামী। রক্তাক্ত লাশ। পড়ে আছে। দেখছেন তিনি।

হযরত আতিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বিরহিনী, বিধুরা। তাঁর অশ্রুভেজা কণ্ঠে উচ্চারিত হলো--

'আমিও কসম খাচ্ছি, আজ থেকে আমার শরীর কখনো নরম কাপড় পরবে না। আমার শরীরে আর কখনো সুগন্ধি ছড়াবে না!'

'তুমি কতো সুন্দর বীর যুবক ছিলে! তৌহিদের বাণীকে উঁচু করার জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে!'

'যতদিন সূর্য ও চাঁদ উঠবে, পাখিরা গাছে গাছে ডাকবে; আকাশে আলো ছড়াবে আর আঁধার হবে তোমার ভালবাসা চমকাবে। তোমাকে মনে পড়বে। তোমার ভালোবাসা আমাকে অস্থির করবে।'--

নতুন দৃশ্য।

যুদ্ধের ময়দান।

বারো হাজারের মুসলিম বাহিনী। ছুটে চলেছে। হুনায়েনের দিকে। মুসলমানদের চেহারায় নিশ্চয়তা আর গর্বের আলো। কারণ তারা সুসজ্জিত। ফারুকী ও হায়দারী শক্তি তাদের সাথে। রুহানী ও দৈহিক শক্তির অপূর্ব মিলন। দুশমনের চেয়ে সংখ্যায়ও তাঁরা তিনগুণ। শত্রু মাত্র চার হাজার। তাঁদের মনে এই সাহস যে বদরের যুদ্ধে আমরা ছিলাম তিন শো তেরো। ওদের এক তৃতীয়াংশ। আজ আমরা তিনগুণ বেশি। কাজেই শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হুকুম। আটার মতো পিষে ফেলবো আজ ওদের। গোশতের কিমা করে ছাড়বো ওদের।

মুসলমান ভুল করলেন।

তাদের দৃষ্টি নিজের শক্তিমত্তার ওপর। আল্লাহতায়ালার ওপর নয়।

হেরে গেল মুসলমান। কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না ওদের সাথে।

পিছু হটছে তারা। সবাই চলে গেছে।

একা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

তিনি ডাকলেন। ঈমানদারদের। ভরসা করতে বললেন আল্লাহতায়ালার ওপর।

এগারো কি বারো জন এসে দাঁড়ালো।

তিনি ফের ডাকলেন। বললেন, 'আমি আল্লাহর নবী! মিথ্যা নয়। আমি বীর আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।'

ওদিকে চিৎকার করে ডাকলেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

'দ্বীনের জিম্মাদাররা। তোমরা কোথায় চলেছো? মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে!

আখিরাতকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কোথায়? এসো, দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ি শত্রুর ওপর। আলিঙ্গন করো মৃত্যুকে। এসো, বীরেরা!'

কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তাদের পশুদের ভেতরেও। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। ফিরতে চাইছে না।

শেষমেশ অনেক চেষ্টায় এক হলেন অষ্টাশি জন। আগে ছিল বারো। মোট এক শো। তাঁরা কাঁদলেন আল্লাহর দরবারে। বললেন, 'সৃষ্টি দিয়ে কিছুই হয় না, সব হয় স্রষ্টাকে দিয়ে।'

এবার ঐশী বিশ্বাসে ভরপুর একশো জন ঝাঁপিয়ে পড়লো চার হাজারের বিরুদ্ধে।

চরম মার খাচ্ছে দুশমন। কেন?

ফিরিশতা নেমেছে। সত্য ও সঠিক বিশ্বাস আসমান থেকে নামায় সাহায্যকারী ফিরিশতা।

বিস্ময়কর বিজয় ঘটলো অল্প সময়েই।---

এটা কোন্ যুদ্ধ! মুসলমান বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে। উনি কে? সেই সৌম্য, প্রশান্ত মহান মানুষটি না? আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু!

তিনি মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাত করার জন্যে পাঠাচ্ছেন সাথী। এদের সাথে কিছু রয়েছে নতুন তাওবাকারী। মক্কা বিজয়ের সময় যাঁরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অনেকে আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দেড় মাসের চেষ্টায় আবার ফিরে এসেছেন।

তাঁরা আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাছে এসে বললেন 'আমরা তাওবা করতে এসেছি।'

'তোমাদের তাওবা কবুল হবে যদি তোমরা নিজ জান আর মাল নিয়ে মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে মুকাবিলার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হও।'

তাঁরা রাজী হলো।

প্রচন্ড সংঘর্ষ চলছে।

অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে দুই বাহিনীর।

টিকতে পারছে না মুসলিমরা দুর্ধর্ষ মুসায়লমার সাথে।

পালাতে শুরু করলেন নতুন মুসলমানরা। এমন কি পুরনোরাও পিছু নিলেন তাঁদের।

কিন্তু যাঁদের হৃদয়ে ঢুকেছিল ইসলামের শক্তি তাঁরা চিন্তা করলেন। ভাবলেন, দ্বীন মিটে যাচ্ছে আর আমরা এভাবে পালাচ্ছি? একটা গর্ত খুঁড়লেন তাঁরা। তাদের শরীর ঢুকিয়ে শুরু করলেন শত্রুর বিরুদ্ধে তীর ছোঁড়া।

জান যায় যাক। পালাবো না। মরার আগে যতজন দুশমন খতম করতে পারি চেষ্টা করবো।

ক'জন সাহাবীর এ আত্মত্যাগ পুরোনদের মাঝে নতুন চেতনা ও বুদ্ধির দুয়ার খুলে দিল। তাঁরা ভাবলেন। গর্ত খুঁড়ে তার মাঝে বসে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়া আর বেহেশ্‌তে চলে যাওয়া সহজ। কিন্তু এতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হচ্ছে না। তাঁরা পুরোনদের ডাকলেন। পরামর্শ হলো।

একজন সাহাবী চিৎকার করে অনলবর্ষী বক্তব্য রাখলেন।

'ইসলামের সাহায্যকারীরা! বাবুল গাছের নিচে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যাঁরা। কোথায় চলেছেন আপনারা?'

প্রচন্ড বিপ্লব ঘটে গেল এ কথায় পুরোনদের মাঝে।

হযরত আবু আকিল আনিসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শরীরে অসংখ্য যখম। আর্তনাদ করছেন। তিনিও শুনলেন। এই ডাক। এগুতে শুরু করলেন। হামাগুড়ি দিয়ে। সামনের দিকে। ওই উদাত্ত আহবান অস্বীকার করে কিভাবে? একজন ঈমানদার? হোক না তাঁর শরীর ক্ষত বিক্ষত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হাজির ছিলেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

আবু আকিল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'দ্বীনের ডাকে সাড়া দিচ্ছি। দ্বীনের জন্যে ডাকা হয়েছে আর আমি সব ফেলে ছুটে আসিনি এমন ঘটনা এর আগে হয়নি। আজও ছুটছি। কিন্তু আমি আহত, ক্ষত বিক্ষত। তাই

হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। হয়তো আমি আমার মৃত্যুর দিকেই চলেছি।'

'আমীর সাহেব তো সুস্থদের ডাকছেন,' আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'আপনি অসুস্থ। এ ডাক তো আপনার জন্যে নয়!'

উত্তরে ওই সাহাবী বললেন, 'তাহলে উনি এভাবে ডাকতেন যে, হে সুস্থ দ্বীনের সাহায্যকারীরা তোমরা এসো। তিনি আনসারীদের ডেকেছেন। আমি তাদেরই একজন। তাই আমি সাড়া দিচ্ছি। যদি মরেও যাই তবুও তো আমিরের ডাকে সাড়া দিয়েই মরলাম।'

আবু আকিল এগুচ্ছেন। তাঁর আহত জায়গায় বাঁধা পট্টি ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। ফিনকি দিয়ে। তবুও তিনি সামনে বাড়ছেন। এক সময় বললেন, 'আমাকে একটা উঁচু জায়গায় বসিয়ে দিন।'

পাথরের ওপর বসানো হলো। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। ক্ষতের ব্যথায় অস্থির শরীর। 'হে দ্বীনের সাহায্যকারীরা!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনারা আজকের দিনকে বদরের দিন করুন। হুনায়েনের মতো আক্রমণ করুন। আল্লাহর সাহায্য আসবেই। অবস্থা দেখে আল্লাহকে ছোট করে দেখবেন না।'

যাঁরা শুনলেন তারা যেন নতুন উদ্যম পেলেন।

এবার সবাই চিন্তা করছে কী করা যায়। মুসায়লামা কেল্লার ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তার সাথে রয়েছে চল্লিশ হাজার সৈন্য। পুরনো একজন সাহাবী হযরত বারা ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, 'এর সহজ উপায় হচ্ছে, কাউকে একটা ইটের ওপর দাঁড় করে দিন। দুটো ঢাল দিন। ঢালের ওপর অন্য একজনকে দাঁড় করে তাকে ভেতরে ফেলে দিন। নিচে পড়া মাত্র ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে খুলে দেবেন দরোজার হুড়কো।'

'কিন্তু কে যাবে?' উদ্বিগ্ন স্বরে শুধালো কেউ।

'আমি।' বারা ইবনি মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন।

তাঁর সুদৃঢ় মনোভাব দেখে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তাই হোক। একজনের মৃত্যুই ইসলামের জয় ছিনিয়ে আনুক। ভেতরে পড়তেই ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুটে এলো। অসংখ্য তরবারির খোঁচা খেয়ে রক্তাপ্লুত হলেন। কিন্তু দিশা হারালেন না। রক্তে স্নান করা শরীর নিয়ে তীর আর তরবারির আঘাত

সইতে সইতে ছুটলেন ফটকের দিকে।

খুলে ফেললেন হুড়কো।

বন্যার স্রোতের মতো ঢুকে পড়লেন মুসলিম বাহিনী।

ওহাশী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হত্যা করে ফেললেন মুসায়লামা কাজ্জাবকে। এলো বিজয়।

সূর্য পাটে যেতে বসেছে।

সাঁঝ হয় হয়।

ফিরে চলেছে মুসলিম বাহিনী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,' আমি অবাক হয়ে দেখি আবু আকিল তখনো বেঁচে। মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। ধুঁকছেন। আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম তাঁর মাথার কাছে। তিনি চোখ মেললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'বিজয় কি হয়েছে?'

'দুশমন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।' ইবনে ওমর বললেন।

আবু আকিল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চোখ বুজলেন। আমি বুঝলাম তিনি আর নেই।

চলে গেছেন।

পরপারে

শুধু মুসলমানদের বিজয় সংবাদ শোনার জন্যে ছিল তাঁর জীবন।



চার

পট পরিবর্তন হয়েছে।

নতুন ঘটনা দেখছেন মাওলানা।

তিনি দেখছেন চোদ্দ'শ বছর আগের মদিনা মানোয়ারা।

মদিনাবাসী আনসারদের দিয়েই দ্বীন ছড়িয়ে পড়েছে। সারা দুনিয়ায়। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়। আরবের লোকসংখ্য ভারতবর্ষের মতো না হলেও আয়তনের দিকে তার চেয়ে ছোট নয়। দুনিয়াতে রোজগারের যে নিয়ম চালু আছে বলতে গেলে তার কিছুই নেই সেখানে। গোটা দেশটাতে এমন কোনো সরকারি ব্যবস্থাপনা নেই যে, অফিস আদালতে চাকরি করে রুজি রোজগারের সহজ ব্যবস্থা করা যাবে।

আল্লাহর ঘরে ফি বছরে আসা হাজী সাহেবদের কাছ থেকেও কিছুই আদায় করা যাচ্ছেনা। উল্টো তাদের জন্যেই খরচ করতে হচ্ছে। খেত খামার আর বাগানও খুব কম। ব্যবসা, বাণিজ্য মক্কা মোকাররমা আর দু' একটা জায়গায় ছাড়া অন্য কোথাও নেই। কোথাও কোথাও সামান্য খেজুর, ডালিম ও আঙ্গুরের

বাগান রয়েছে। সবার কাছে নেই কাপড়, থাকার জায়গা, খাবার আর পানি। খিদের তাড়নায় অনেক সময় হারাম পর্যন্ত খাচ্ছে। পোকা মাকড়, সাপ, রক্ত! প্রায় এলাকার লোকজন বেকার আর ক্ষুধার্ত ।

অন্য দেশগুলো তাদের ওপর শাসন পর্যন্ত চালাতে ইচ্ছে করছে না।

কারণ শাসন কাজে আকৃষ্ট করার জন্য যে সব লাভজনক জিনিষ থাকা প্রয়োজন তা তাদের নেই। যেমন সোনা, পেট্রোল ইত্যাদি। রোম ও পারস্য সম্রাটেরা আরবের সীমান্তে এজন্যে সেনা পাহারায় রাখছে যাতে করে এই খিদে আর পিয়াসায় কাতর আরবেরা তাদের ওপর হামলা করে না বসে। যে দেশে রাজা বাদশারা পর্যন্ত শাসন করতে সাহস পায় না, সেখানে আল্লাহপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে দ্বীনের মেহনত শুরু করাচ্ছেন। মদিনা ছাড়া আর যে সব এলাকা কৃষি ও ব্যবসার কেন্দ্র ছিল সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর বিরোধিতা শুরু করেছে। সমস্ত আরবের চোখ মক্কাবাসীদের উপর। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারাও করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মক্কাবাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করছে। এ অবস্থায় দাওয়াতের যত আমল হচ্ছে তা মদিনা শরীফ থেকে হচ্ছে। যে কোন জায়গায় কেউ ইসলামে আসছে তাকে সাথে সাথে মদিনাতে ডাকা হয়। মদিনা এমন এক বসতি যেখানে মুসলমানেরা তাদের ভাই-বেরাদার, বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ ছেড়ে এসে বসবাস করতে শুরু করছেন। তাদের বেশির ভাগই তখন নিজের এলাকা থেকে হিজরত করছেন। সাথে করে ধন-সম্পদ নিয়ে আসতে পারছেন না। মদিনার আনসারদের উপরই তাঁদের থাকা খাওয়ার ভার। মদিনা এমন এক বসতি যেখানে বাইরের আর এলাকার সবাই সমান। মোহাজেরদের কেউ কেউ তো ফকিরই, বাকীদের রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদের কারো মাল সম্পদ হিজরতের সময় তাদের কবিলা বা বংশের লোকেরা ছিনিয়ে নিয়েছে। মোহাজের মদিনাতে খালি হাতে এসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর সাথে দ্বীনের মেহনত শুরু করছেন। প্রথম অবস্থায় মোহাজেরদের কামাই রোজগারে নিষেধ করা হয়নি। যতদিন পর্যন্ত তাদের রোজগারের ভাল কোন ব্যবস্থা হয়নি ততদিন পর্যন্ত আনসাররাই তাদের প্রয়োজন পুরো করছেন। মদিনাবাসীদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছুচ্ছে যে, কমপক্ষে দশ বছর পর্যন্ত টানা তাদের ব্যবসা ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে কাজ করার দরকার। কারণ তাদের উপরই

খরচের সম্পূর্ণ ভার। কাজ কারবারে আরো বেশি সময় খরচ করার দরকার। যাতে করে সব রকমের খরচ করার ভালো ব্যবস্থা হয়। কাজেই এমনিতে বাইরে বের হয়ে কোন সফরে বা জেহাদে যাওয়ার কোনরকম সুযোগই নেই। কিন্তু তারপরেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাবাসীদের রোজগারের দিকে না নিয়ে এই দশ বছর তাঁদের নিয়ে নিজের মেহনত করছেন। এবং দ্বীনের মেহনতের এমন এক নকশা কায়েম করছেন যে, মানব জীবনের সব প্রয়োজন -যার মধ্যে আছে বিবি, ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন এবং কামাই রোজগার-তা থেকে বারবার ছুটিয়ে দ্বীনের মেহনত করালেন। তাঁদেরকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যে যখনই তাঁদেরকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে বলা হচ্ছে, যত জনকে বলা হচ্ছে, যে স্থানের জন্য বলা হচ্ছে, যখনই বলা হত তখনই সব ছেড়ে বের হয়ে পড়তেন। এমনকি যাকে মাগরিবের সময় জেহাদে বের হতে বলা হচ্ছে তাঁকে ঐ রাতে আর মদিনাতে থাকতে দেয়া হচ্ছে না। যেমন পাক্কা নামাজী আজানের আওয়াজ শুনলে সব ছেড়ে দিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ে, তেমনি মদিনাবাসীরা আল্লাহপাকের রাস্তায় বের হওয়ার নামে সবকিছু ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। যখনই আল্লাহর রাস্তায় (ঈমান ও দ্বীনের প্রয়োজনে) বের হবার ডাক শোনা যায় তখনি তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন। বের হয়ে পড়ছেন আল্লাহর পথে। যদিও তা জিনিসপত্র বেচা কেনার সময়, দোকান খোলার সময়, খেজুর কাটার সময়, বিবাহ বাসরে, কনে বিদায় দেয়ার সময়, মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় বা অসুস্থতার সময় হচ্ছে। যখনি ডাক আসছে, তখনই তারা সব ব্যস্ততা ছেড়ে হাতের কাছে যে রসদ ও সামানা আছে তা নিয়েই বের হয়ে পড়তেন। এভাবেই সাহাবারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বের হয়ে পড়েন আল্লাহপাকের রাস্তায়। এ সফরগুলোতে জান ও মালের কষ্ট সহ্য করার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে তাদের।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মনোয়ারার দশ বছরের জীবনে প্রায় দেড়'শটি জামাত বের করেছেন। যার মধ্যে পঁচিশটি সফরে তিনি নিজে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদেঁর সাথে আছেন। কোন সফরে দশ হাজার জন বের হয়েছেন (মক্কা বিজয়ে), কোনটিতে পঞ্চাশ জন, কোনটিতে দশজন, কোনটিতে হাজার জন, কোনটিতে তিনশত তেরজন (বদর যুদ্ধ), কোনটিতে দশজন, কোনটিতে পনের জন, কোনটিতে আটজন, কোনটায় সাতজন বের হচ্ছেন। সময়ের হিসেবে কোনটিতে দু'মাস, কখনও তিন মাস,

কখনও বিশ দিন, কখনও পনের দিন লাগছে। বাকী এক'শ জামাত বের হয়েছে। তাদের মধ্যে কোন সফরে হাজার জন, কোনটিতে পাঁচ'শ জন, কোনটিতে ছ'শ জন। এ ছাড়া কম ও বেশি সংখ্যায় বের হচ্ছেন।

সময়ের হিসেবে কোনটাতে ছ'মাস, কোনটাতে চার মাস এবং কম বেশি সব রকমের সময়ই লাগছে। তাই এখন হিসাব করতে হবে প্রত্যেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এঁর ভাগে গড়ে কত সময় লাগছে। প্রত্যেক বছরে কতগুলো সফর করছেন। সমস্ত সফরকে এক করে দেখা যায় প্রত্যেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বছরে ছ'সাত মাস বাইরে আল্লাহপাকের রাস্তায় কাটিয়ে দিচ্ছেন।

এছাড়া নানান জায়গার নতুন মুসলমানদের ডেকে বলা হচ্ছে, 'মদিনাতে এসে দ্বীন শিক্ষা কর'। কারণ ইসলামী জীবন শিখতে হলে ইসলামী পরিবেশের প্রয়োজন। আর এই পরিবেশ একমাত্র মদিনা শরীফেই আছে। তাই মদিনার আনসারদের ভাগেই পড়ছে এই নতুন মুসলমানদের তা'লীম বা শিক্ষা দেয়ার গুরুভার। মদিনাতে থাকার সময় তাঁদেরকে মসজিদের আমলের জন্য সময় বের করতে হচ্ছে। যেন মসজিদে শেখা আর শেখানোর কাজ এক টানা চলতে পারে। আর নতুন মুসলমানদের দ্বীন দীক্ষা দেয়ার কাজ অবিরাম চলতে পারে। শেখা আর শেখানোর কাজ এক টানা চলতে পারে। মদিনাবাসীরা তাঁদের জীবনের পদ্ধতিকে এমন করে নিয়েছেন যে, যদি দুজনে মিলে এক সাথে কারবার বা কৃষি কাজ করছেন তবে পালাক্রমে মসজিদের আমলেও শরীক হচ্ছেন। একজন দিনে এলে অন্যজন রাতে আসছেন। এশার পর কেউ এবাদতে মশগুল হচ্ছেন, অন্যজন বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করছেন। এভাবে পালাক্রমে চব্বিশ ঘন্টাই স্থানীয় লোকেরা মসজিদে হাজির থাকছেন। যখনই বাইরের কেউ আসছেন, তখনই তাঁকে বা তাঁদের সামলাতে মসজিদে কেউ না কেউ হাজির থাকছেনই। তাঁরা বাইরে থেকে আসা অতিথিদের নামাজের সময় নামাজে, জিকিরের সময় জিকিরে, তা'লিমের সময় তা'লিমে শামিল করাতেন। অতিথিরা কক্ষনো নিজেদেরকে অবসর মনে করছেন না।

হিসেব করলে ছয় সাত মাসতো বাইরের সফরে খরচ হতো আর মসজিদের আমলে দুই আড়াই মাস। তাহলে দুনিয়াদারীর জন্য কতটুকু সময় বাকী থাকলো? এভাবে প্রত্যেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু- এঁর বাইরের সফরে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। নতুন মুসলমানদের তালীম বা শিক্ষা ও তরবিয়ত বা

দীক্ষা দিতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। একদিকে আমদানী ও রোজগার সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক কমে গেছে, অন্যদিকে খরচ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। বাইরের সফরের খরচ, নিজের সংসারের খরচ, মেহ্‌মানদারীর খরচ, মদিনাবাসী গরীবরা সফরে বের হচ্ছেন তাঁদের খরচ, যানবাহন, খানা-পিনার খরচ, বাইরে থেকে ধনীরা এলে তাদের দাওয়াত করে খাওয়ানোর খরচ, দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার লোকদের সাহায্য করার খরচ- মূল কথা হলো সফরের ও মদিনায় থাকার সময়ের খরচ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু রোজগারের রাস্তা ধীরে ধীরে কম হচ্ছিল। শেষমেষ এ অবস্থা হল যে বাইরে এবং ঘরে অনাহার শুরু হলো। শীত ও গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। নিজেদের জীবনের উপর কষ্ট টেনে এনে ভেতরের ও বাইরের মেহনতকে চালাতে হচ্ছে।

তার ফল এই হয়েছে যে ঈমানের কর্মী যখন ঈমানের প্রয়োজনকে নিজেদের রোজগার ও সংসারের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন তখন আল্লাহ্ পাক খুশি হয়ে গোটা আরবের অধিবাসী, কওম, গোত্র ও কবিলাকে ইসলামে এনে দিচ্ছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর তাঁর সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদেঁর কোরবানীর বদলে ওই সব লোকদেরও চরিত্রের পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। যাদের সংশোধনের সাহস রাজা, বাদশা বা কোনও শাসকরা পর্যন্ত করেন নি। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন যখন গোটা আরববাসী ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছেন। এবং মদিনার প্রতিটি ঘর সম্পদ শুন্য হয়ে গিয়েছে! যে ইসলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর উপস্থিতি এবং তাঁর মেহনতের দ্বারা প্রসারিত হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় গোটা আরববাসী মুরতাদ হয়ে গেছে বা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন। যেন কেয়ামত পর্যন্ত মানুষেরা বুঝতে পারে যে, যখনই মুসলমান এই দ্বীনী মেহনতকে নিয়ে দাঁড়াবেন তখনই দুনিয়ার অবস্থাকে আল্লাহপাক দ্বীন দিয়ে বদলে দিবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর ওফাতের পর পরই সিদ্দিকে আকবার আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনা শরীফের মুসলমানদের এতটুকুও অপেক্ষা করতে দেননি। সবাইকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের করে দিচ্ছেন। এমনকি অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তিন দিন ও তিন রাত মদিনাতে আক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সব সাহাবীই ওসামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সাথে সিরিয়ার পথে জেহাদে বের হয়ে গিয়েছেন। বাকি দেড়'শ জামাত মদিনার আশপাশে বের হয়েছিল। বের হবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ নেই,

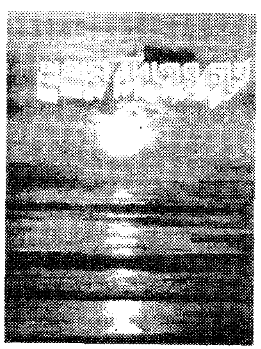
কিন্তু শুধুমাত্র আমীরের হুকুম পালন করার জন্যে বের হয়ে গিয়েছেন।

তখন আল্লাহ পাক এ মেহনতের ফল গোটা দুনিয়াবাসীকে দেখাচ্ছেন। খুব কম সময়ে আরববাসী আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এমনকি আরবের একটি বাচ্চাও ইসলামের বাইরে নেই। এতে মাত্র এক মাস সময় লেগেছিল। শুধু এই নয় যে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন বরং ঈমানের পরিপূর্ণ মেহনতকারী তৈরি হয়েছেন।

মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ফের দেখতে পাচ্ছেন আসল মেহনতের রূপরেখা।

ভাবছেন–

এমন একটা পরিবেশ তৈরি হতে হবে যাতে করে যখন যাকে যে স্থানের জন্য বলা হবে সব ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহপাকের রাস্তায় বের হয়ে যাবে। অন্য দিকে, বাইরের লোকেরা তাদের এলাকায় আসবেন দ্বীন শেখার জন্যে, তখন তাদের নিয়ে দ্বীনের মেহনত করবেন।



পাঁচ

তিনি দেখছেন।

কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

আবু তালহা আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বোখারার কোনো এক বিজন বনে দাফন করা হচ্ছে। আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু চলেছেন ইস্তাম্বুলের পথে। কবর হচ্ছে কনস্টান্টিনোপোলে।

হিশাম বিন আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বদরী সাহাবী। তাঁর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে আজরাদিন এর মাঠে।

নোমান ইবনে মাহদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তাঁর আহত দেহ ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে নেহাওয়ান্দের ময়দানে।

মায়াম্মার ইবনে মাহদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। ইয়েমেনের সর্দার। তাঁর কবর নেহাওয়ান্দের বিজন মাঠে।

হাজার হাজার সাহাবী পারস্যের কাদেসিয়ায়।

চীনের ক্যান্টন শহরে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের বাবা আবু ওয়াক্কাস ও তাঁর চল্লিশ জন সাথীর কবর।

বদরের নির্জন প্রান্তরে সত্তর জন সাহাবী শুয়ে আছেন। ওকবা বিন নাফে রাদিয়াল্লায়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবর বিসকেরাতে।

মাআবাদ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রুশ সমরকান্দে।

হুযাইফা বিন মুসলিম আল বাহী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবর ফারগানাতে।

মাআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যাঁর হাতে ওলামাদের পতাকা থাকবে কাল হাশরের মাঠে। তিনি মদিনার ইলমের মজলিশ ছেড়ে ইয়ারমুকের মরুভূমিতে গিয়ে শুয়ে আছেন।

ওবায়দল্লাহ বিন জারারাহ, আবদুল্লাহ ইবনি রাওয়াহা, জায়িদ বিন হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে পঁচিশ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে উরদুনের মুতায়।

সত্তর জন সাহাবা কুফায়।

সত্তর জন সাহাবা লিবিয়ায়।

পাঁচশো সাহাবা মিশরে।

ওক্কবা বিন আমের ও ফজল বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিরিয়ায়।

হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছুটে চলেছেন দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

কী কাজে?

কেন?

ভাবছেন।

নিযামুদ্দিনের মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি।

তিনি দেখতে পাচ্ছেন আত্মোৎসর্গকারী সাহাবী রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুদেঁর। কিভাবে তাঁরা বের হয়ে পড়ছেন বিবি বাচ্চা ফেলে। চলে যাচ্ছেন আল্লাহর রাস্তায়। বিলিয়ে দিচ্ছেন মাল। অকাতরে বলি দিচ্ছেন প্রাণ। তাদের উদ্দেশ্য দ্বীনের দাওয়াত। ইলায়ে কালিমায়েতুল্লাহ। কালিমার প্রচার। দুনিয়া জুড়ে কালিমাকে উঁচু করা।

তাদের আত্মত্যাগ এতো উঁচু পর্যায়ের যে, মহান রাব্বুল আলামিন তার পবিত্র কালামে পাকে আলোচনা করছেন এ ব্যাপারে। 'যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে, আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা চালিয়েছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে (অসহায় মুহাজিরদের) এবং সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি মু'মিন। তাদের জন্যে ক্ষমা আর উত্তম রিজিক। যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে আর প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারাও তোমাদের দলে।' -সুরা আনফাল

সুরা তাওবায় বলেন-

'প্রথম যারা হিজরত করেছিল আর যারা তাদের সাহায্য করেছিল এছাড়া পরে যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের সবার ওপর রাজী হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর ওপর রাজী হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরি করে রেখেছেন যাব তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী। তাতে ওরা থাকবে চিরকাল।'

তিনি দেখতে পাচ্ছেন কেমন করে ওরা হিজরত করছেন। কেমন করে নুসরত করছেন। কেমন করে দাওয়াত দিচ্ছেন। সবার কাছে। সব জায়গায়। সব অবস্থায়। সব সময়। এই দাওয়াত দিতে গিয়ে দিচ্ছেন ঘাম। রক্ত। জীবন।

তিনি দেখছেন রক্তের সাগর তৈরি হচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা থেকে ঝর্ণা। ঝর্ণা থেকে স্রোতস্বিনী। তার থেকে নদ-নদী। তার থেকে সাগর। মহাসাগর।

রক্ত দিচ্ছেন আমীর হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, বিলাল ইবনে রাবাহ হাবশী, সাঈদ ইবনে যায়ীদ, সুরাহবিল ইবনে হাসানা, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, সাইয়্যিদিনা আবু সালামা আবদুল্লাহ মাখদুমী, ইবনে উম্মে মাকতুম, আরকাম ইবনে মাখরামা, সুমামা ইবনে আসালা হানাফী, খাব্বাব ইবনুল আরাত, সালামা ইবনে আকওয়া আসলামী, আসর ইবনে আবাসা, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক, আবু রহুম মানসুর গিফারী, ইমাম ইবনে সায়লাবা, কবি ইবনে মালিক আনসারী, জায়েদ ইবনে আকরাম আনসারী, বারা ইবনে মালিক, আবু জাবির আবদুল্লাহ সুলামী, জায়িদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব, আমর ইবনে জামুহ সালমী, মুয়াজ ইবনে জাবাল আনসারী, হাবীব ইবনে জায়িদ আনসারী, বাশীর ইবনে সাদ আনসারী, খুযায়মা ইবনে সাবিত খুতামী, আবদুর রহমান ইবনে সাবিত খুতামী, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর সিদ্দিক, যেহাক ইবনে সুফিয়ান, আত্তাব ইবনে উমুরী, আবদুর রহমান ইবনে সামুরা, কায়েস ইবনে আসেস মেনকারী, তামীম ইবনে আউস দারী, হানজালা, মুসাইয়্যিব ইবনে ওমায়ের, ওয়াহাব ইবনে কাবুস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আজমাঈনদের দাওয়াতের আমাল।

যাবতীয় কোরবানী সব পরিষ্কার ছবির মতো ভাসছে তাঁর চোখের সামনে।

আবার অন্য দৃশ্য।

নতুন যুগের দাওয়াত ও কোরবানী।

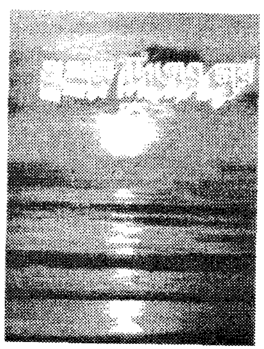
এবার তিনি দেখতে পাচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ জাফর সাদেক, উয়ায়েস আল ক্বারনী, হাসান বাসরী, মালেক দীনার, মুহাম্মদ ওয়াসে, হাবীব আযমী, আবু হাশেম মক্কী, উৎবাতুল গোলাম, রাবেয়া বাসরী, ফোজাইল ইবনে আয়াজ, ইব্রাহিম আদহাম, বিশরে হাফী, যুননুন মিসরী, বায়াজীদ বোস্তামী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক, সুফিয়ান সাওরী, আবু আলী শাকীক বালখী, ইমাম আযম আবু হানিফা, ঈমাম শাফেয়ী, ইমাম আহাম্মদ ইবনে হাম্বল, দাউদ তায়ী, হারিস মুহাসেবী, আবু সোলায়মান দারানী, সাইয়্যিদ আবদুল কাদির জিলানী, আহমাদ ইবনে আবুল হাসান রিফাঈ, খাজা আবদুল খালেক আজযাওয়ালী, খাজা ওসমান হারুনী, নাজমুদ্দিন কোবরা, শাহাবুদ্দিন সাহরাওয়ার্দী, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ তাবরিজী সাহরাওয়ার্দী, মুহিউদ্দিন আরাবী, বাহাউদ্দিন যাকারিয়া সাহারাওয়ার্দী সুলতানী, ঈমাম গাযযালী, শেখ ফরিদুদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর, খাজা মইনুদ্দিন হাসান চিশতী, খাজা আলী আহমদ সাবের কালিয়ারী, শেখ জালালুদ্দিন, কবীরুল আওলিয়া, শেখ ফখরুদ্দিন ইরাকী, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী, বুআলী

কালান্দর, খাজা শামসুদ্দিন তুর্ক পানিপাথী, নিযামুদ্দিন বাদাউনী, নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, আশরাফ জাহঙ্গীর সামনানী, শাহ নেয়ামাতুল্লাহ, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, মুহাম্মদ গীসুদারায, মুজাদ্দেদে আলফিসানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, মাওলানা শাহ ঈসমাঈল শহীদ, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিদের।

প্রত্যেকের দাওয়াতের নিয়ম কানুন সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের তেইশটি বছরের প্রতিটি দিন, ঘন্টা, মিনিট আর মুহূর্ত। পরিষ্কার হয়ে গেছে আজ কেন মুসলমানদের এই দুরাবস্থা।

কোন্ আমল ছুটে যাবার কারণে আজ দোয়া কবুল হচ্ছে না? আমলের ভেতর জান নেই। প্রাণহীন ইবাদাত। নাড়ির রোগ ঈমানহীনতা। দাওয়াতের আমাল না থাকার কারণে ঈমান দুর্বল। একীন হারা।

কোন্ বিশেষ পদ্ধতিতে সাহাবা, অলিআল্লাহ দাওয়াতের মেহনত করেছেন। এখন কিভাবে করতে হবে সব তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হলো।



ছয়

ধ্যান ভাঙছে তার।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি এঁর।

কী বলেছিলেন ওই বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা। এত গভীর আর তাণ্ডব ছিল সে শব্দে যে যুগ যুগ তাকে ভ্রমণ করালো?

চৌদ্দ'শ বছর এক দুপুরে পার হয়ে গেল!

চোখ মেলে তাকালেন মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি ।

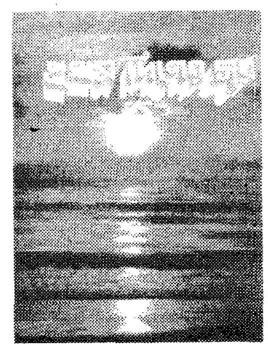
বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা এখনও কাঁদছেন।

কি ওর ব্যথা? কি ওর শক্তি? যাঁর কথা মানুষের চেতনার রুদ্ধ দুয়ারকে এমন ভাবে খুলে দেয়?

তাঁকেই কি আল্লাহ কবুল করলেন এই উম্মতের ফের হেদায়াতের দরজা খোলার জন্যে।

যুগে যুগে আল্লাহ বুঝি এমন করেই মানুষের ধারণার অতীত ঘটনা ঘটান। সুব্হানাল্লাহ!

আশ্চর্য!



সাত

নিঝ্‌ঝুম দুপুর।

বিশ্বপ্রকৃতি আজ নিরব।

পৃথিবীর অন্তর জুড়ে কি এক অতৃপ্তি আর না পাওয়ার বেদনা গুমরে গুমরে

উঠছে যেন। কী যেন তার ছিল পাবার। পায়নি। যুগ যুগের সেই জমাট নিরাশার ব্যথা আজ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে প্রবল বেগে ছুটে যেতে চাইছে কোথাও। লক্ষ মানুষের ফোঁটা ফোঁটা জমাট অশ্রু আবার পানি হয়ে উত্তাল বেগে ধেয়ে যেতে চায় কোথায়!?

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে রয়েছেন বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা। খানিকক্ষণ কেঁদেছিলেন তিনি মাথা নিচু করে। তাই মাওলানার চেতনার দুনিয়ায় যে বিচিত্র ঘটনা ঘটে চলেছে তিনি ঠাহর করতে পারেনি। নইলে দেখতে পেতেন মসজিদের ছাদ থেকে নেমে এসেছিল নূরের ধারা। চোখ তুলতেই সেটা যাদুমন্ত্রের মতো অদৃশ্য হয়েছে ঠিক কিন্তু হযরত মাওলানার চেহারা একী রূপ! যেন ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে অঙ্গার। চোখ ফুটে বেরিয়ে আসছে বৈদ্যুতিক প্রভা।

দাড়ি ঘামে ভেজা। ফোঁটায় ফোঁটায় মণিমুক্তা ঝরছে যেন তা থেকে। গোটা পরিবেশটা অবিশ্বাস্য নির্জন, নিথর আর গম্ভীর হয়ে গেছে। যেন কবর। বোঝাই যাচ্ছে কী যেন ছিল এখন নেই।

ওকি?

মাওলানার দৃষ্টি এমন কেন? পলকহীন কোথায় চেয়ে আছেন তিনি? কী দেখছেন? সুদূরে চেয়ে। উনি এমন কাঁপছেন কেন? একী! মনে হচ্ছে যেন মসজিদটাই কাঁপছে। নাকি গোটা বিশ্ব জগত কাঁপছে। থর থর করে বাইরে কি সূর্যের আলোও ক্রমশঃ জোরাল হয়ে উঠেছে?

টাঙ্গাওয়ালা একবার ভাবলো এটা বুঝি তার নিজস্ব কল্পনা।

কিন্তু না-সত্যিই অদ্ভুত একটা শব্দ। অস্পষ্ট। মানুষের। কিন্তু অচেনা তাদের ভাষা। কোলাহলের শব্দ। সূর্যের আলোর সাথে শব্দও বেড়ে উঠছে।

শহরে, বন্দরে, গুহায়, খোলামাঠে, সাগর-মহাসাগর, মাটির নিচে। হাজার হাজার শহীদান, সালেহীন, অলি, গাওস, কুতুব, সাহাবা, নবী পয়গম্বর যেন জেগে উঠেছেন। সবার চেহারায় খুশির ছাপ। আকাশে, বাতাসে, বেহেশতে, দোজখে, অন্তরীক্ষে, পাতালে উঠেছে আওয়াজ।

শুভ সংকেত।

চৌদ্দশো হিজরী।

শাহ নে'মাতুল্লাহর ভবিষ্যত বাণীতে ঠিক এ সময়ের কথাই লেখা রয়েছে।

এই সময়েই পাল্টে যাবে পৃথিবীর গতানুগতিক ইতিহাস। বস্তুবাদী, জড়বাদী জগতের যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি অসার প্রমাণিত হবে। বিফল হবে সব প্রশাসন। চরম ব্যর্থতার মুখ দেখবে রাজনৈতিক মতাদর্শ। প্রতি পদে মার খাবে শয়তানের কারসাজি।

বিগত কয়েক শতকের যুদ্ধ, দুঃখ-দুর্দশা, অরাজকতা আর অসন্তোষের ঘূর্ণিস্রোত, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস, খুন-খারাবি, পৈশাচিক যৌন অনাচার-এ সব কিছুই আসল নাটক মঞ্চস্থ হবার আগের প্রস্তুতি। শেষ বারের মতো বদলে যাবে মানুষ। তাই তার অন্তর পার্থিব সাজ-সজ্জা, নিয়ম কানুনের ওপর থেকে হতাশ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার কষ্টি পাথর।

নূহের সময় যারা করেছিল টিটকারী আর অবিরাম অত্যাচার।

মুসা আলাইহিস সালামের সময় যারা করেছিল জীবিত দাফন, পিরামিডের পাথরের নিচে তিল তিল করে হত্যা আর অমানবিক অত্যাচার।

ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সময় যারা জ্বালিয়েছিল তিন মাইল উঁচু, সাতাশ বর্গমাইল জোড়া অগ্নিকুন্ড।

ঈসা আলাইহিসসালামের সময় যারা ধর্মপ্রাণ মানুষকে সিংহের পেটে যাওয়ার দৃশ্য দেখে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়েছিল।

তারাইতো সীজারের সময় করেছে হর্ষধ্বনি। হিটলারের সময় উপভোগ করেছে ইহুদীদের প্রতি অত্যাচার আর গণহত্যা, খৃষ্টানরা অত্যাচার করেছে ভারতবর্ষের মানুষের ওপর।

গণতন্ত্রের মুখ আর মানুষ দেখতে পায়নি।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এই গ্রহের শান্তি। নেই হয়ে গেছে প্রেম। ভালবাসা। স্নেহ, মায়া আর মমতা।

নেশাপানিতে আসক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার রোজকার ধারা। পূর্ব থেকে পশ্চিম আজ মানুষ তার ভাইয়ের বুকে ছুরি হানতে দ্বিধা করছে না।

পৃথিবীজোড়া দুর্ভিক্ষ, অরাজকতার সাথে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো।

সবই রয়েছে হাদিস শরীফে।

সূর্যের প্রখর তাপ যতই বাড়ছে ততই বেড়ে চলেছে কোলাহল। পৃথিবীর কেন্দ্রের বেসল্টের ভিত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নিযামুদ্দিন বাঙলাওয়ালী মসজিদের আধো আলো অন্ধকার ঘরের ঠান্ডা মেঝেয় বসে ভয়ানক বিস্ময়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো টাঙ্গাওয়ালা।

তার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে মেঝেয়।

মেঝেয় জমা মানুষের চোখের উত্তপ্ত পানি গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। বেঁটে খাটো মানুষটার পায়ের কাছে।

কিন্তু তিনি টের পাচ্ছেন না।

তিনি আছেন অন্য জগতে।

বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা দেখলেন এক অপূর্ব নূরে আসমান জমিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই আলোতে চাঁদ-তারা আরো হয়েছে ঝলমল। কীসের যেন আজ শুভ সংবাদ। যে খবরের জন্যে যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি রয়েছে প্রতীক্ষায়। কুল মাখলুক আজ সেই আনন্দে আত্মহারা।

আকাশের বাসিন্দারা ছুটোছুটি শুরু করেছে আর বাঁশি বাজছে অলৌকিক সুরে পাহাড়ের কন্দরে। সবাই আজ অভিভূত, বিস্মিত, পুলকিত, শিহরিত।

বনের পশু পাখির মনে লেগেছে দোলা। মহাসমুদ্রের ঢেউগুলো হাজার ধারায় উন্মাতাল ছুটেছে আবার।

লেলিনের দেশে মসজিদের বন্ধ দুয়ার গেছে খুলে। কূয়ার ভেতর জীবিত দাফন করা হাজার হাজার আলেম আসমান-জমিন কাঁপিয়ে উচ্চারণ করছে আজানের মহান বাণী।

হিন্দুস্থানের মূর্তিগুলো চিৎকার করে উঠেছে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলে।

সোয়া লাখ আম্বিয়া আবার যেন মানুষের মাঝে এসে পড়েছেন। চলেছে দাওয়াতের আমাল।

নিযামুদ্দিনের এই পুরনো মসজিদে আজ একী অপরূপ দৃশ্য!

কোন প্রাচীন যুগ থেকে আজানুলম্বিত জুব্বাধারী, লাঠি হাতে ওই সারি সারি মহামানবেরা উঠে এলেন? সূর্যের আলোয় আলোকিত আজ মসজিদ। উনি কি নূহ?

উনি কি সালেহ? উনি কি হুদ? উনি কি মুসা? উনি কি ইব্রাহিম? উনি কি ঈসা?

উনি কে?

সবচেয়ে উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়!

বেহেশতী খুশবুতে ভরে উঠেছে আবার নিযামুদ্দিন বাদাউনী রহমতুল্লাহি আলাইহির মহল্লা।

সব দৃশ্য অদৃশ্য হয়েছে।

জ্ঞান ফিরেছে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির।

সৃষ্টির অন্তর ভেদ করে চিৎকার উঠছে 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাসির, কুম, ফা আন্‌জির অরাব্বিকা ফাকাব্বির।'

বেহেশতের ঝরোকা থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে। এসব লাল নীল সবুজ সুরভিত ফুলগুলো কীসের? হেদায়েতের?

অনন্ত নক্ষত্র বীথি জানাচ্ছে সালাম। বিশ্ব বীণার তারে আজ এ কোন্ অলৌকিক সুর! এ কোন হৃদয়তন্ত্রী ছেঁড়া গান। ছায়াপথের তারায় আজ কীসের কাঁপন? সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ কোন প্রাণের বন্যা!

অবাক পৃথিবী।

আবেগে কাঁপছে প্রকৃতি।

নিসর্গের নীলিমায় প্রবল চঞ্চলতা।

কি যেন পেয়ে খুশিতে নির্বাক নীলাকাশ।

বনে বনে পাখিরা গেয়ে উঠলো গান।

বাতাসে কিসের ফিসফিসানি। অমল ধবল বার্তা নিয়ে ছুটে চলেছে সে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু। সুমেরু থেকে কুমেরু।

সূর্যমুখী তার চোখ মেলছে।

খুশিতে উদ্ভাসিত।

পাহাড় থেকে ঝর্নাধারা তুমুল বেগে চলল নদ-নদীর দিকে।

নদীর ঢেউ ছুটলো সাগর পানে।

সহস্রধারায় সাগর চুটলো দিগ্বিদিক।

দিশে হারিয়েছে সে প্রাণের বন্যায়।

আকাশ তার রঙধনু রঙ নিয়ে ছুঁয়েছে মাটি। চলেছে কীসের কানাকানি। আকাশ আর মাটির সব তিথি আজ মধুতিথি পূর্নিমা প্রজাপতি হয়ে বর্ণালী রঙ ছড়িয়েছে।

পাহাড়ের চূড়ায়-

সাগরের ধারায়-

আঁধার গুহায়-

প্রাসাদে কুটিরে-

আকাশে সাগরে-

হাওয়ায় নিলীমায়-

ধরণী থেকে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর জুড়ে-

তেত্রিশ কোটি দেবতারা যুগযুগান্ত ধরে অধীর আগ্রহে যে জিনিসের জন্যে প্রহর গুণছিল সে যেন আজ এসে পড়েছে। আজ কি তার গৌরবের দিন। সবচেয়ে যে নিঃস্ব, সবচেয়ে যে রিক্ত তারই অন্তর আজ এমন কি এক ঐশ্বর্যে ভরে গেল?

মেওয়াতের দুর্ধর্ষ পাহাড়ী দস্যুরা হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে 'থ হয়ে গেল।

পাহাড়ের উপত্যকা, চূড়ায় এ কোন দৃশ্য? এত আলো এত রূপ কোত্থেকে এলো? গরুর পালে, ভেড়ার দলে, ঘোড়ার বহরে এই উল্লাস কেন?

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এক প্রবল আলোড়ন। চরম পাওয়ার তৃপ্তি আজ আকাশে, সাগরে, অরণ্যে।

বিশ্বভুবনে নেমে এসেছে আজ অনন্ত কল্যাণ, অফুরন্ত প্রেম, অসীম আশীর্বাদ।

ওই শোনা যার মহাকালের পায়ের আওয়াজ।

প্রকৃতির কুঞ্জবনে আজ আবার বসন্ত দেখা দিয়েছে।

আবার গেয়ে উঠেছে মহান গান। মৃত রিক্ত মরু।

কালো পৃথিবীর গভীর গাঢ় কালো আদিম আকাশ চিরে জাগছে প্রথম দিনের সূর্য। কেটে যাচ্ছে এক হাজার বছরের জমাট আঁধার।

চাদ্দিক ছেয়ে যাচ্ছে আভায় আভায়।

ভোর হচ্ছে।

অসহ্য সুন্দর।

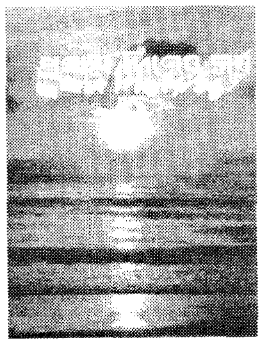
بدأ الاسلام غريبا سيعود كما بدأ فطوبى للغرابى

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় এসেছিল, আবার অপরিচিত হবে। তখনকার অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ!'

দ্বিতীয় ঢেউ

কে তুমি?!

প্রথম দিনের সূর্য



লিখেছেন

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ

শফিউল্লাহ কুরাঈশী

উৎসের সন্ধানে

সত্তুর বছর আগে।

দিল্লীর উপকণ্ঠে খাজা নিযামুদ্দিনের মাজার। কাছেই চাওষাটখাম্বা নামের ঐতিহাসিক ভবন। এর লাল ফটকের ওপরের ছোট একটা ঘর। এখানে বাস করেন একজন আল্লাওয়ালা মানুষ। নাম মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল।

তাঁর পূর্বপুরুষের বসতভিটা ছিল মোযাফফর নগর জেলার ঝানঝানাতে। যখন তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি তখন কান্দালওয়াই এর সুবিখ্যাত মুফতী ইলাহী বক্স পরিবারে বিয়ে করলেন। কান্দালাতে যাওয়া আসা বেড়ে গেল। একসময় এখানেই স্থায়ী ভাবে বাস করতে লাগলেন।

ধর্মানুরাগ আর জ্ঞান চর্চার জন্যে ঝানঝানা আর কান্দালার সিদ্দিকী শেখ পরিবার আশপাশ ও দূরদূরান্ত পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় উঁচু মর্যাদা আর সম্মান পেয়েছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল আর মুফতী ইলাহী বক্স ছয় পুরুষ পর্যন্ত অভিন্ন ছিলেন। বংশ গতিধারা ছিল নিচের মতো--

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল; তাঁর ছেলে, গোলাম হোসেন; তাঁর ছেলে, হাকিম করিম বক্স; তাঁর ছেলে, হাকিম গোলাম মহিউদ্দিন; তাঁর ছেলে, মৌলভী মুহাম্মদ সাজ্জাদ; তাঁর ছেলে, মৌলভী মুহাম্মদ ফাইয়াজ; তাঁর ছেলে মৌলভী মুহাম্মাদ শরীফ, তাঁর ছেলে মৌলভী মুহাম্মাদ আশরাফি; তাঁর ছেলে শেখ জামাল মুহাম্মদ শাহ্; তাঁর ছেলে শেখ বাবান শাহ্; তাঁর ছেলে শেখ বাহাউদ্দিন শাহ্; তাঁর ছেলে মৌলভী মুহাম্মদ শেখ; তাঁর ছেলে শেখ মুহাম্মাদ ফাজিল, তাঁর ছেলে সর্বজনাব কুতুব শাহ্।

মুফতী ইলাহী বক্স ছিলেন শাহ আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট ছাত্র। একদিকে প্রসিদ্ধ শিক্ষক, সুবিখ্যাত লেখক, প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ইউনানী চিকিৎসক। ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান আর যুক্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। আরবী, ফার্সী আর

উর্দু কবিতায়ও তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। তাঁর ভাষার এই অপরিসীম দক্ষতা প্রমাণ পেয়েছে যখন "বানা'ত সুআদ" এর ধারা বিবরণী প্রকাশ পেল।

তিনি 'হযরত কাআব' এর প্রতিটি ছত্র আরবী, ফারসী আর উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। আরবী আর ফারসী ভাষায় তিনি প্রায় ৪০ টির মতো বই লিখেছেন। এর মাঝে নাম পেয়েছে 'সিয়ামুল হাবীব' আর 'মাথনাউই রুম কা তাকলীমা'।

মুফতী ইলাহী বক্স বাইয়াত হন শাহ আবদুল আজিজের হাতে। যদিও তিনি নিজেই আধ্যাত্মিক জগতে বিজ্ঞ ছিলেন। এটা ছিল তাঁর নিজেকে বিলীন করে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত আত্মা অর্জন করার সাধনা। শাহ আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর তারই তরুণ শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহীদের হাতে বাইয়াত হন। তিনি মুফতী সাহেবের চেয়ে বয়সে আটাশ বছরের ছোট। বড় মানুষেরা চিরকালই নত থাকেন।

মাথনাউই হলো বড় কবিতা। পরম্পরা অন্তমিল যার বৈশিষ্ট। রুমীর মাথনাউই প্রসিদ্ধ, জনপ্রিয় ও পরিচিত হয়েছে 'মাথনাউয়ী জালালউদ্দিন রুম' নামে। ফার্সী ভাষার জগদ্বিখ্যাত এক অনবদ্য সৃষ্টি হচ্ছে এই মাথনাউই। এই সাহিত্য কর্ম ফরাসী ভাষায়ও ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য রতন হিসেবে পরিচিত হয়েছে। মুফতী ইলাহী বক্স এই মহান সাহিত্যটির তাকলীমা রচনা করেন।

মুফতী সাহেব ১৭৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিরাশি বছর বয়সে ১৮৩৬ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছেলে ও নাতিরা সবাই মানুষ হিসাবে ছিলেন জ্ঞানী আর সম্মানিত। এঁদের দুটো বড় গুণ ছিল। তা হচ্ছে জ্ঞানান্বেষণ আর ধর্মের ওপর প্রবল ঝোঁক। মৌলভী আবুল হাসানের 'মাথনাউয়ী, 'গুলজারে ইব্রাহিম' ধরণের কবিতাগুলো অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে লালন করছে। এসব কবিতাগুলো তাঁর লেখা 'বাহ্‌র-ই-হাকীক্বাত' বইয়ের অংশ। আজ পর্যন্ত এটা জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর ছেলে মৌলভী নুরুল হাসান আর চার নাতি মৌলভী জিয়াউল হাসান, মৌলভী আকবর, মৌলভী সুলাইমান, হাকিম মৌলভী ইব্রাহীম প্রমুখ খ্যাতনামা পূর্বপুরুষদের সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে নিজেরাও বিখ্যাত হয়েছিলেন।

মুফতী সাহেবের ভাতিজা মাওলানা মোজাফফর হোসেন ছিলেন একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ। তিনি শাহ ইসহাক এঁর প্রিয়তম শিক্ষার্থী। তাছাড়া সাইয়েদ আহমদ শহীদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক কিছু

তিনি কখনো ছুঁয়েও দেখেননি। তাঁর দান, ইবাদাতের ঘটনা আজো ওই এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছিলেন তিনি তাঁর সময়েই। মনে রাখার মতো সেসব ঘটনাগুলো ইসলামের স্বর্ণযুগের কথা মনে করে দেয়। মাওলানা মোজাফফর হোসেনের মেয়ের ঘরের নাতনির সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইলের বিয়ে হয়। অক্টোবরের ৩০ তারিখ, ১৮৬৮ সালে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে।

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল ছিলেন ইলাহী বক্স এঁর সন্তানদের গৃহ শিক্ষক। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সাথে সম্পর্ক ছিল। চাওষাট খাম্বার লাল তোরণের ওপরের ঘরে আমরা তাঁকে থাকতে দেখেছি। এরই কাছে একটা ছোট মসজিদ। তার সামনের অংশ ব্যবহার হতো মির্যা ইলাহী বক্‌স এর দরবার হিসেবে। এই মসজিদ 'বাঙলাওয়ালী মসজিদ' নামে পরিচিত।

মাওলানা তার দিনগুলো সবার অজ্ঞাতে কাটাচ্ছিলেন। এমনকি মির্যা ইলাহী বক্সেরও মাওলানা সাহেবের উঁচু আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। তারপর একসময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন যে কিভাবে মাওলানার দোয়া আল্লাহতায়ালার কাছে কবুল হয়।

মুসাফিরদের খিদমত করা, ইবাদত, জিকির, কোরআনুল কারিম শেখানো, ঈমানের ব্যাপারে বোঝানো আর পথ দেখানোই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ। সেই পথে যাওয়া আসা করে এমন পিপাসিত মুটে মজুরের মাথার বোঝা নিজ হাতে মাটিতে নামিয়ে রাখতেন। কূয়া থেকে পানি তুলে পান করাতেন তাদের। তারপর তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। শুকরিয়া জানাতেন আল্লাহর কাছে। এজন্যে যে তাঁকে মানুষের সেবার সুযোগ দিয়েছেন। আর একথা মনে করতেন, 'হে আল্লাহ আমি তো এতো বড় সৌভাগ্যের যোগ্য নই। তবু তুমি তাওফিক দিচ্ছো।'

একবার তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহি কে সুলুক শেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে গঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন, 'আপনার এটা দরকার নেই। আপনি এর মধ্যেই সুলুকের শেষ লক্ষে পৌঁছেছেন।' এটা এমন যেন কোনও ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়ার পর বলছে যে আরবী ভাষায় প্রথম পাঠ পড়া দরকার।

কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার গভীর অনুরাগ ছিল মাওলানা ঈসমাইল সাহেবের। তিনি ছাগল চরাতেন আর কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এটা তাঁর

পুরোন অভ্যেস ছিল। পরিবারের ক'জন সদস্যের ওপর খেয়াল রাখতেন। রাতের বেলায় তিনি তাদের আমল দিতেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা ইয়াহিয়া মাঝরাত পর্যন্ত আররী পড়তেন তখন মাওলানা ইয়াহিয়া ঘুমোতে যেতেন। বড় ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদকে জাগিয়ে দিতেন রাতের শেষ অংশে।

কারো বিরুদ্ধে মাওলানা সাহেব কখনো হিংসা পোষণ করেন নি। দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। সেজন্যে তিনি সবার আপন হয়েছিলেন। যাঁরা কাছে আসতো সবাই তাঁর ধর্মানুরাগ, আন্তরিকতা আর স্বার্থহীন হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতো। দিল্লীর বিবাদমান দলগুলোর নেতারা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এরা একজন অপরকে পছন্দ করতো না, একে অন্যের পেছনে নামাজ পড়তো না। কিন্তু মাওলানা সাহেবের প্রতি ওদের সবারই ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর আস্থা।

তিনি বেঁচে থাকতেই মেওয়াতের সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল। একদিন তিনি মসজিদ থেকে বেরুলেন। উদ্দেশ্য, কোনও এক মুসলমানকে মসজিদে এনে নামাজ পড়াবেন। ক'জন দিনমজুরের সাথে তাঁর দেখা হলো। ওরা কাজে যাচ্ছে। তিনি তাদের ডাকলেন। শুধালেন, 'আজ তোমরা কত আয় করবে?'

রোজ তারা যা পেতো সেটাই বলল। তিনি বললেন, ' তোমরা যদি সেই মজুরী এখানেই পেয়ে যাও?'

'তাহলে তো কাজ খোঁজার দরকার নেই।' তারা উত্তর দিল।

তিনি দিন-মজুরদের নিয়ে মসজিদে ঢুকলেন। তাদেরকে শেখালেন নামাজ। কালিমা আর কোরআন। দিন শেষে দিয়ে দিলেন তাদের মজুরী তারা খুশি। পরদিন। সেই পথে আবার দাঁড়িয়ে তিনি দিন-মজুরদের পাওনা দেবার কথা দিয়ে ঢোকালেন মসজিদে। নতুন উদ্যমে চললো নামাজ শেখা, সুরা-কেরাতের মশক বা চর্চা আর কালিমা সহিশুদ্ধ করে পড়ানো। দিন শেষে মজুরী দিয়ে দিতেন। বিপুল উদ্দীপনা দেখা গেল দিন-মজুরদের মাঝে। তাদের ভেতর গড়ে উঠলো নামাজ পড়ার অভ্যেস। বাঙলাওয়ালী মাদ্রসার প্রথম ছাত্র ছিল ওইসব দিনমজুর। এরপর প্রায় দশজন মেওয়াতি ছাত্র সব সময়ের জন্যে মাদ্রাসায় রয়ে গেল। এদের খাবার আসতো মির্জা ইলাহী বক্সের বাসা থেকে।

১৮৯৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন। দিল্লীর বাহরাম এলাকার তিহারায় খাজুরওয়ালী

মসজিদ। এখানেই তিনি মৃত্যুর সময় ছিলেন। শবযাত্রাটি ছিল বিস্ময়কর। খাটিয়ার দু'ধারে লম্বা বাঁশ বেঁধে দেয়া হয়েছিল। সবাই যাতে খাটিয়া কাঁধে নিতে পারে। তিন মাইল পথ। কিন্তু এতো বেশি লোক ছিল যে বেশিরভাগ মানুষই দীর্ঘ বাঁশ কাঁধে নিতে পারেনি।

নানান দল আর চিন্তাধারার সব মুসলমান যাঁরা কখনো একসাথে হননি, তারা সবাই শবযাত্রায় শরীক হলেন। মাওলানা সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া রহমতুল্লাহি বলেন, 'আমার বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ কোমল হৃদয়ের বিনয়ী মানুষ। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম তিনি হয়তো অন্য দলের কাউকে শবযাত্রার দায়িত্ব দিতে বলবেন। সেক্ষেত্রে অন্যেরা প্রার্থনায় শরীক হতে অস্বীকার করবে। একটা অস্বস্তিকর আর অযাচিত পরিবেশ তৈরি হবে। তাই আমি নিজেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। শবযাত্রায় নেতৃত্ব নিজে নিলাম। সবাই শান্তিমতো দোয়ায় শরীক হলেন।

অনেক লোক ছিল। তাই বেশ ক'বার জানাজা পড়াতে হলো। দাফনের দেরি হয়ে গেল। এসময় শ্রদ্ধেয় এক বয়স্ক বুজুর্গ আর অপর একজন যিনি সবার কাছে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন মাওলানা একথা বলছেন- 'আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দাও। আমি লজ্জা পাচ্ছি। কারণ আমার জন্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করছেন।'

মাওলানা মুহাম্মদ ঈসমাইল রহমতুল্লাহি আলাইহির তিন ছেলে। প্রথম স্ত্রীর মাওলানা মুহাম্মদ আর মাওলানা ইয়াহিয়া। দ্বিতীয় স্ত্রীর ওরসে মাওলানা মুযাফফার হোসেনের নাতি। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি

১৮৮৫ সালের এক সোনালী সকাল।

এই দুনিয়ার মুখ দেখলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি।

কান্দালার এক ছোট কুটিরে। নানাবাড়িতে কাটলো তাঁর শিশু সময়। একটু বড় হতেই চলে এলেন বাবার কাছে। নিযামুদ্দিনে।

এইদিনগুলোতে কান্দালা পরিবার ছিল ধর্মের প্রকৃত ও উজ্জ্বল নমুনা। পরিবারের উঁচু ধর্মীয় মূল্যবোধ, রাতের আরাধনা, যিকির আর কোরআন তিলাওয়াতের চর্চাকে আমাদের আজকের দিনের মৃত অন্তরের মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় মনে হবে।

মহিলারা নফল নামাজে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। পুরুষ আত্মীয়দের পেছনে দাঁড়িয়ে তারাবির নামাজ আর অন্য সব নফল ইবাদাতে কোরআন শুনতেন। আর রমজান মাস কোরআন তিলাওয়াতের জন্যে মধু মাস ছিল যেন। সব ঘরেই অনেকক্ষণ ধরে কোরআন পাক তিলাওয়াত করা হতো।

উর্দু অনুবাদ আর ধারাবিবরণীসহ কোরআন পড়া, 'মাযাহিরি হক' 'মাশারিফুল আনওয়ার' আর 'হিসনে হাসিনে'র চর্চা চলতো সারাদিন। সৈয়দ আহমদ শহীদ আর শাহ আবদুল হামিদের পরিবারে দ্বীনের জন্যে আত্মোৎসর্গ আর অবদান ছিল পারিবারিক আলোচনার বিষয়। এই দুই সুবিখ্যাত আল্লাহওয়ালার জীবনের সত্য ঘটনাগুলো সবার মুখে মুখে ছিল। রাজারাণী, জলপরী আর আকাশপরীর কাহিনী না শুনিয়ে বাচ্চাদের শোনাতেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা আর আত্মবলিদানের রোমহর্ষক সত্য ঘটনা।

মাওলানা সাহেবের নানী আমাতুস সালাম। পরিবারে তিনি আম্মিবি নামে পরিচিতা। তাঁর নামাজ সম্পর্কে মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এক সময় আমি দেখলাম তাঁর নামাজে মাওলানা গঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহির নামাজের ছায়া। সেই একই ঐকান্তিকতা, ধ্যান আর নিবিষ্ট তন্ময়।'

জীবনের শেষদিকে আম্মিবি কখনো খাবার চাইতেন না। যদি কেউ তার সামনে খাবার রেখে যেতো শুধু তখনই খেতেন। এটা ছিল একটা বড় পরিবার। নানান ঘরোয়া কাজ থাকতো। টুকিটাকি কাজের চাপে খাবার কথা ভুলে যেতেন তিনি। সেদিন না খেয়েই থাকতেন। একদিন কেউ তাঁকে বলল, 'আপনার বয়স হয়েছে। আপনি দুর্বল। না খেয়ে কি করে থাকেন?'

'আল্লাহর স্মরণ করি। প্রাণশক্তি পাই।' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির মা শাফিয়া বিবি খুব ভালো কোরআন শিখেছিলেন। পুরো কালামে পাক রোজ তিলাওয়াত তাঁর নিয়মিত অভ্যেস ছিল। তার ওপর তিনি আরো দশ পারা তিলাওয়াত করতেন।

তাঁর কোরআন তিলাওয়াত এতো ঝরঝরে ছিল যে সারা দিনের কাজের কোনো ক্ষতি হতো না। রোজার মাস ছাড়া অন্য সময় তাঁর রোজকার ইবাদাত এমন ছিল-

পাঁচ হাজার বার দরুদ শরীফ;

পাঁচ হাজার বার ইসমে জাত আল্লাহ;

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এক হাজার বার;

ইয়া মুগনীউ ৯০০০ বার;

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১২০০ বার;

ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম ২০০ বার;

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল ৫০০ বার;

সুবহানাল্লাহ ২০০ বার;

আমহামদুল্লিাহ ২০০ বার;

আল্লাহু আকবার ২০০ বার;

আস্তাগফার ৫০০ বার;

ওয়া আফ্‌বিদু আমরি ইলাল্লাহ্ ১০০বার;

রাব্বি আন্নি মাগলুবুন ফানতাসীর ১০০০ বার;

রাব্বি আন্নি মাস্‌সানিয়াদ্ দুররু ওয়া আনতা আরহামার রাহিমিন ১০০ বার।

পরিবারের আর সবার মতো মাওলানা সাহেব মক্তবে তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি নেন। পারিবারিক ঐতিহ্য মতো তিনিও কোরআনুল কারিম মুখস্ত করেছিলেন। কোরআনের চর্চা তাঁর পরিবারের সাধারণ বিষয় ছিল। তাই দেখা যেতো পারিবারিক মসজিদের দেড় কাতার মুসুল্লীদের মাঝে এমন এক ব্যক্তিও ছিলেন না যিনি কোরআনের হাফেজ ছিলেন না।

নানীজান আম্মিবির সবচেয়ে প্রিয়জন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি । তিনি তাঁকে প্রায়ই বলতেন, 'আমি তোমার মাঝে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুঁদের সৌরভ অনুভব করি। আমি যেন দেখছি সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের মতো পবিত্র সাথীরা তোমার সাথে রয়েছেন।'

আল্লাহর অনুগ্রহস্নাত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুঁদের

জীবনে ধর্মীয় যে উষ্ণতা, আবেগ আর আন্তরিকতা ছিল, ছেলেবেলা থেকেই তা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির মাঝে প্রকাশ পেতে থাকে। এই দিক দেখে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার বললেন, 'আমি যখন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াসকে দেখি তখন আমার সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুঁদের কথা মনে পড়ে যায়।'

ঈমানের ব্যাপারে তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে আর স্বভাবের গভীরতম প্রদেশে প্রচন্ড এক আগ্রহ আর আবেগ প্রগাঢ় ভাবে গেঁথে ছিল। এমনকি ছোট বেলায় তিনি যা করতেন তা সাধারণ আর দশজন ছেলেপুলেদের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা। রিয়াজুল ইসলাম কান্দালভী তাঁর মক্তবের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন লাঠি হাতে এলেন। আর বললেন, "এসো, রিয়াজুল ইসলাম, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদ করি যারা নামাজ পড়ে না"।'

গাঙ্গোহে হিজরত

১৮৯৩ সালে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া গাঙ্গোহ যান। উদ্দেশ্য ছিল হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে থাকা। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতার সাথে কখনো নিযামুদ্দিন আবার মাঝে মাঝে কান্দালায় নানাবাড়িতে কাটাতেন। ব্যক্তিগত ইবাদাতে তাঁর বাবা গভীর তন্ময় থাকার জন্যে ছেলের লেখাপড়ার দিকে খেয়াল দিতে পারেননি। তাছাড়া ছোট ছেলের ওপর তাঁর ছিল অসীম মমতা। তাতে লেখাপড়ার ক্ষতিই হচ্ছিল বলতে হয়। তাই মাওলানা ইয়াহিয়াছ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন ছোট ভাইকে সাথে নেয়ার জন্যে। পিতা রাজী হলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ১৮৯৬ এর শেষে বা ১৮৯৭ এর পয়লা দিকে গাঙ্গোহে চলে এলেন। বড়ভায়ের কাছে পড়াশোনা শুরু করলেন। শিশু শিক্ষা শুরু হলো বিশেষভাবে।

সে সময় গাঙ্গোহ ছিল সুফি, সাধক আর জ্ঞানী লোকদের ঠিকানা। তাঁদের দুর্লভ ও মূল্যবান সঙ্গ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির জন্যে সহজ হয়ে গেল।

ছেলেবেলাটা তাঁর কেটে গেল এই সব মহান পুরুষদের সাথে। তাঁর বয়স তখন দশ কি বারো। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। প্রাণবন্ত জ্যোতির্ময় যুবক। এভাবে তিনি গাঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে ছিলেন নয় বছর।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। উপকারী বন্ধু। তাঁর মনে সারাক্ষণ এই আশা যেন তার ভাই এইসব সুবিখ্যাত আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাময় বিশিষ্ট মহান মানুষগুলোর কাছে থেকে সবচেয়ে বেশি জেনে আর শিখে নিতে পারে। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, 'যখন জ্ঞানী ওলামারা এখানে আসতেন তখন আমার বড় ভাই শেখানো বন্ধ করে দিতেন। তাঁদের সাথে কথা বলতেন। শিখতেন। আমাকে শুনতে ও শিখতে সাহায্য করতেন।'

ছাত্র ও বাচ্চাদের মাওলানা গাঙ্গোহী বাইয়াত করতেন না। শুধু লেখাপড়ার জীবন শেষ হলে তারা অনুমতি পেতেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির ব্যতিক্রমধর্মী ও অসাধারণ মেধা ও মনন দেখে তাঁকে বাইয়াত করে নিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর আশিক বান্দা ছিলেন। আল্লাহওয়ালাদের ওপর তাঁর ছিল প্রচন্ড ভক্তি আর অনুরাগ। মাওলানা গাঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে থেকে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে ছাড়া তিনি শান্তি পেতেন না। রাতে উঠে পড়তেন। কখনো সখনো গাঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে গিয়ে তাঁকে দেখে ফিরে আসতেন।

মাওলানা গাঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহিরও তাঁর প্রতি ছিল গাঢ় ভালবাসা। একদিন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বড় ভাই ইয়াহিয়াকে বললেন, 'ভাই, গাঙ্গোগী রহমতুল্লাহি আলাইহির যদি অনুমতি থাকে তাহলে তিনি পড়ার সময় তাঁর পাশে বসবেন।' মাওলানা ইয়াহিয়া এই কথা গাঙ্গোহী রহমতুল্লাহি আলাইহি কে জানালেন। তিনি বললেন, ' এতে কোনও অসুবিধে নেই। আমার নির্জনতা, মানসিক প্রশান্তি ইলিয়াসের উপস্থিতিতে নষ্ট হবে না।'

জিকির করার সময় মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির হৃদয়ে এক ধরনের ভোঁতা ব্যথা অনুভব করতেন। মাওলানা গাঙ্গুহীকে একথা বললেন। শুনে ধ্বক করে উঠলো গাঙ্গুহী রহমতুল্লাহি আলাইহির হৃদপিন্ড। তিনি

খানিকক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ কাশেম নানুতুবী একই অনুভূতির কথা জানিয়েছেন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে। তিনি একথার পর কাশেমকে লক্ষ্য রাখলেন। পরে বললেন, "আল্লাহতায়ালা তাঁকে দিয়ে এক বিশেষ কাজ নেবেন"।'

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির শিক্ষা দান নিয়ম ছিল মৌলিক ধরনের। তিনি শুরুতে বই পড়াতেন না। আগে ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাতেন। দুই বা তিন অক্ষরের মিলিত শব্দ জুড়তে দিতেন। শব্দগুলো বসানো শেখাতেন। ছাত্রদের শুরুতেই সাহিত্যের ওপর জোর দেয়া হতো। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর "চাহাল হাদিস" আর আম সিপারা বই দুটো দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'মনে প্রাণে সিপারা মুখস্ত করবে মুসলমানের ছেলে। তাদের শব্দ পড়ার দরকার নেই। শুধু অর্থ জানতে হবে।' তিনি আরো বলতেন, 'হাদীস ও কোরআনের শব্দগুলো বিশেষ মৌলিকতার আধার।'

মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহির আসল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মানসিক গুণাবলীতে সাজানো। একটা বই পুরোপুরি পড়ানো হলো কিনা সেদিকে তিনি খেয়াল রাখার দরকার মনে করতেন না। ছাত্রদের কাছে মূল বই ধরিয়ে দিতেন। নোটবই বা সাহায্যকারী বইয়ের দরকার মনে করতেন না। কোনও সাহায্য ছাড়াই তাকে পড়তে হতো। কয়েক পাতা। পড়ার পর আপনা আপনি ব্যাখ্যা করতে পারতো। পড়াও ঝরঝরে হয়ে যেত। ছাত্রকে সময় নিয়ে বোঝাতেন। যাতে সে আত্মবিশ্বাসী আর উদ্যমী হয়ে ওঠে।

মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহির শরীর কখনোই ভালো থাকতো না। গাঙ্গুহীতে থাকার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভয়ানক মাথার যন্ত্রণায় ভোগেন। সিজদা দেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা টানা কয়েক মাস পর্যন্ত চললো। মাওলানা গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহির ছেলে হাকীম মাসুদ আহমেদ। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি খুব অদ্ভুত ধরনের ব্যবস্থা নিতেন। কোনো ধরনের রোগের জন্যে তিনি পানি খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিতেন। এটা রোগীদের জন্যে ছিল সহ্যের বাইরে। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর চিকিৎসকের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

টানা সাত বছর তিনি পানি পান করেন নি!

পরের পাঁচ বছর পানি পান করেছেন তবে খুব রেখে ঢেকে।

অসুখের জন্যে তাঁর শিক্ষা জীবনের ছেদ পড়লো। আবার লেখা-পড়ায় ফিরে আসার আশা ছিল না। তবু তাঁর আগ্রহের কমতি ছিল না। কিন্তু তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা অনুমতি দিলেন না। একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া বললেন, 'পড়া-লেখা করে আর কি হবে?'

'তাহলে বেঁচে থেকেই আর কি হবে?' সাথে সাথে উত্তর দিলেন ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি । তিনি আবার পড়ালেখায় মন দিলেন।

১৯০৫ সালে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন। মাথার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পড়ছিলেন। মাওলানা গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি বলতেন, 'দুটো আঘাত আমাকে নিদারুণ ব্যথা দিয়েছে। একটা হলো আমার বাবার মৃত্যু আর অন্যটা হলো হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী'র বিচ্ছেদ।'

১৯০৮ সালে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দ যান। মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে তিরমিজি আর সহীহ বোখারী পড়ার জন্যে। তাঁর মুরুব্বী মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহমতুল্লাহি আলাইহি আর দুনিয়াতে না থাকায় মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশনার আর শিক্ষার জন্যে খলিল আহমদ সাহারানপুরীর কাছে পাঠালেন। তাঁর দেখা শোনায় তিনি সুলুকের নানান স্তর সম্পূর্ণ করেন।

ইবাদাতে নিমগ্নতা

মাওলানা গাঙ্গেহী রহমতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি নিরব হয়ে যান। বেশির ভাগ সময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। মাওলানা জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এই সময় আমরা তাঁর কাছে ফার্সীর প্রথম পাঠ পড়েছি। তখন তাঁর অভ্যাস ছিল শাহ আবদুল কুদ্দুসের সমাধির পেছনের চত্বরে মোটা পাটি বিছাতেন। বসতেন, এক পা অন্য পায়ের ওপর রেখে। তারপর পুরোপুরি চুপ হয়ে যেতেন। আমরা পড়া বলার জন্যে তাঁর সামনে আসতাম। বই খুলে তাঁর সামনে রাখতাম। আমাদের উচ্চকণ্ঠে পড়তে হতো। ফার্সী কবিতা অনুবাদ করতে হতো। ভুল হলেই তিনি ধরে ফেলতেন। আঙ্গুলের নির্দেশে বই বন্ধ করে দিতেন। তার মানে আমাদের ফের পড়া ভাল

ভাবে মুখস্থ করে আসতে হবে।

তিনি নফল ইবাদাত খুব বেশি করতেন। এ সময়টুকু সেজন্যেই ঠিক ছিল। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত তিনি নফল ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল কুড়ি বছর।

আবেগের তীব্রতা আর উৎসাহ

তাঁর সত্তায় ছিল সুতীব্র আবেগ আর প্রচন্ড উদ্যম। যেটা সব সফলতার চাবিকাঠি। শুধু ঋজু সংকল্প, ঐকান্তিক ইচ্ছা আর নিরন্তর প্রচেষ্টা তাঁকে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। যদিও তিনি স্বাস্থ্যহীন ছিলেন।

তাঁর শেষ অসুখের সময় তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি তখন খুবই অসুস্থ, খুবই দুর্বল বোধ করছি। এমন কি আমি নিচে নামতে পারছি না। হঠাৎ শুনলাম মাওলানা সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি দিল্লীতে এসেছেন। শুনে এতো আবেগ তাড়িত হলাম যে তখনি দিল্লী রওনা হই। পায়ে হেঁটে। যাত্রাপথে আমার অসুখ আর দুর্বলতা টের পাইনি। আমার আজ মনে পড়ছে যে আমি সেদিন ভীষণ অসুস্থ ছিলাম।'

আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ

এ সময় মাওলানা গাঙ্গুহীর অনুসারী আর অন্যান্য আধ্যাত্মিক বুজুর্গদের সাথে নিয়মিত দেখা হতো। মাওলানা আবদুর রহিম রায়পুরী আর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'তাঁরা আমার মনে জায়গা করে নিয়েছেন।'

আর ওই দুই বুজুর্গ বলতেন, 'মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ভিন্নধর্মী গুণাবলীর অধিকারী।'

জিকির, শোগল, নফল ইবাদাতের সাথে সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির অন্তরে জিহাদের বীজ লুকিয়ে ছিল। সারা জীবন তিনি এর থেকে আলাদা ছিলেন না। সেজন্যেই মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে জিহাদের বাইয়াত হয়েছিলেন।

বড়দের দৃষ্টিতে

জীবনের শুরুতেই তিনি তার পরিবারের বড়দের কাছে সবদিক দিয়ে সম্মানিত ছিলেন। সে সময়ের আধ্যাত্মিক দুনিয়ার বড় বড় বুজুর্গদের কাছেও তিনি অকৃত্রিম সম্মান পেয়েছেন। মাওলানা ইয়াহিয়া ছিল তাঁর পিতার মতো। তবু ছোট ভাইকে এমন ভাবে দেখতেন যেমন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুর সাথে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক ছিল।

দৈহিক অসুস্থতা তাঁকে কায়িক পরিশ্রম থেকে বিরত রেখেছিল। তিনি নিজেকে পড়া লেখা, জিকির, আর অন্য সব ইবাদাতে পুরোপুরি মশগুল রাখতেন। অন্য দিকে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া ছিলেন মেহনতী মানুষ।

তাঁর একটা বইএর দোকান ছিল। সেটা তিনি ঠিকঠাক চালাতেন। এটা শুধু তাঁরই রুজি রোজগারের উপায় ছিল না; এর থেকেই তাঁর ভাই মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহিও চলতেন। একদিন দোকানের ম্যানেজার অভিযোগ করলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াসের ব্যবসা নিয়ে কোনও আগ্রহই তো দেখি না। এমন অলস মনোভাব তো তার ভবিষ্যতের ক্ষতি করবে। যদিও তিনি বসে বসেই লাভ পাচ্ছেন।' এ কথা শুনে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া খুব রেগে গেলেন। বললেন, 'সবলদের কাছে রুজি আসে এই সৌভাগ্যবান দুর্বল ভাইটির জন্যেই। সাবধান, তাকে কোনো কটু কথা বলবে না। যা বলার তা আমাকেই বলবে।'

কোনো এক সময় মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহিকে দিব্যজ্ঞানী বিখ্যাত ধর্মীয় বুজর্গরা আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন নেতারা তাদের সে সময়ের কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দিতে বলেছিলেন। শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার সৌভাগ্যক্রমে একই সাথে কান্দালায় অবস্থান করছিলেন। নামাজের সময় হলো। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হলো ইমামতি করতে। পরিবারের বয়স্ক বুজুর্গ মৌলভী বদরুল হাসান ঠাট্টা করে বললেন, 'এমন ছোট টাঙ্গা বড় বড় মাল টানার জন্যে বাধ্য হয়েছে।'

'টানার জন্যে আকার নয় শক্তির দরকার,' তাঁদের মাঝ থেকে একজন উত্তর দিলেন।

শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন

১৯১০ সালে মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক সহ অনেক লোক সাহারানপুর থেকে হজ্বে গেলেন। তখন দরকার পড়লো মাদ্রাসায় নতুন শিক্ষক নেয়ার। নিয়োগপ্রাপ্ত আর ক'জনের মঝে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। তাঁকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বই পড়াতে দেয়া হয়েছিল। হজ্ব শেষে পুরোন শিক্ষকরা ফিরে এলেন। নতুনদের অব্যাহিত দেয়া হলো। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির চাকরি ঠিক থাকলো ।

তাঁকে এমন কিছু বই পড়াতে হয়েছিল যেগুলো তিনি পড়েননি। কারণ মাওলানা ইয়াহিয়ার নির্দেশ তাই ছিল। তিনি পাঠ্যবই পড়া জরুরী মনে করেননি। এছাড়াও তিনি অসুস্থ ছিলেন। সেজন্যে মাধ্যমিক মানের আরো কিছু বই তাঁর পড়া হয়নি। এই শূন্যতা পূরণের জন্যে তিনি এ সময় অনেক সাধনা করেন। আর ক্লাসে যাবার আগেই তাঁর বক্তব্যগুলো তৈরি করে রাখতেন। যেমন 'কানযুল দ্বাকাইক' বইটি পড়ানোর জন্যে তিনি 'বাহরুর রঈক', 'শামী' আর 'হেদায়া' নামের বইগুলো পড়ে নেন।

মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি 'নুরুল আনোয়ার' বইটি পড়ানোর জন্যে হিশামীর সহায়িকা আর উক্তিগুলো পর্যালোচনা ও আলোচনা করতেন।

বিয়ে

১৯১২ সালের ১৭ অক্টোবর জুমআর দিন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মামা মাওলানা রকিবুল হাসানের কন্যাকে বিয়ে করেন। বিয়ে পড়ান মাওলানা মোহাম্মাদ।

বিয়ের অনুষ্ঠনে হাজির ছিলেন মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি , শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আর মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর রহমতুল্লাহি আলাইহির মতো বিখ্যাত বুজুর্গ। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির লেখা সুবিখ্যাত "ফাওয়ায়িদ-উস-সুবহাত" নামে ধর্মীয় উপদেশমূলক রচনা ওই অনুষ্ঠানে পড়া হয়েছিল। এই সাহিত্য সৃষ্টি অসংখ্যবার ধারাবাহিকভাবে সে সময় প্রকাশিত হতে থাকে।

প্রথম হজ্ব

১৯১৫ সালে মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আর মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র হজ্ব করার নিয়ত করলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথা জানতে পারলেন। তিনিও হজ্বে যাবার জন্যে মন থেকে গভীর তাড়না অনুভব করলেন। দই বুজুর্গ মদীনার পথে চলেছেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি জন্যে ভারতে থাকা বেদনাময় মনে হতে লাগলো। হতাশায় ছেয়ে গেল তাঁর মন। তিনি সাহারানপুরে আর থাকতে পারলেন না। এদিকি হজ্বে যেতে পারছেন না। কারণ মুরুব্বীদের অনুমতির দরকার। মনের ব্যাকুলতা বুঝতে পেরে তাঁর বোন আর মৌলভী ইক্‌রামুল হাসানের স্ত্রী নিজের গহনা ভায়ের হাতে হজ্বের খরচ হিসেবে তুলে দিলেন। মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহির মা অনুমতি দিলেন। যা ছিল আশাতীত। পরে মাওলানা ইয়াহিয়াও ভায়ের অস্থিরতায় সাড়া দিলেন।

এবার খলিল আহমাদ সাহরানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে চিঠি লিখলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি অনুমতি চেয়ে। তাঁকে বললেন 'তিন উপায়ে যাত্রাপথের খরচের ব্যবস্থা হতে পারে। বোনের গহনা বা সম পরিমাণ টাকা ধার নিতে পারেন। এছাড়া নির্দিষ্ট ক'জন আত্মীয় যারা টাকা দিতে চেয়েছিল তা নিতে পারেন।

মাওলানা খলিল আহমেদ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে একই নৌকায় বেড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছিল মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির। তিনি ১৯১৪ সালের অগাস্ট এখানে এসে ফের মাদ্রাসার দায়িত্ব নেন।

বন্ধু বিরহে

উনিশশো পনের সাল। নয় আগস্ট। বুধবার। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়ার ইন্তেকাল হয়। এই আচমকা বিদায় মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির জন্যে ছিল বড়ই হৃদয় বিদারক। তাঁর ভেতর তৈরি হয় গভীর হতাশা আর তীব্র বেদনাবোধ। একদিকে তিনি ছিলেন ভাই, শিক্ষক আর উপকারী সজ্জন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিয়োগ ব্যথা ভুলতে পারেন নি। ভায়ের কথা

বলতে গিয়ে এক বিমূর্ত আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। অতীতের মায়াময় ভাবনায় হারিয়ে যেতেন।

ঠিক দু'বছর পর।

তাঁর ভালবাসার জগত থেকে হারিয়ে গেলেন তাঁর ভাই মাওলানা মোহাম্মদ রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি নিযামুদ্দিনের বাঙলাওয়ালী মসজিদে থাকতেন। এখানে একটি মাদ্রাসা ছিল। ওখানে পড়াশোনা করতো মেওয়াতের শিশুরা। এই মাদ্রাসার আয়ের কোন উৎস ছিল না। আল্লাহতায়ালার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এর খরচ পাতি।

দিল্লী মেওয়াতের অনেক লোক মাওলানার ভক্ত ছিল। তাঁর কথা ও দিক নির্দেশনা তাদের দেখিয়েছিল সত্য সহজ সরল পথ। তাঁর চেহারা ছিল আধ্যাত্মিক দ্যুতিতে ঝলমলে। মাঝে মাঝেই তিনি ধর্মীয় দাওয়াত দিতেন। সহজ সরল ভাষায়। উন্নত চরিত্রের আর ঐকান্তিক ইবাদাতের।

তিনি একবার চোখের রোগে পড়লেন। চোখের নিচে হয়েছিল ফোঁড়া। রোজ প্রায় সাতবার খুলে যেত। অস্ত্রোপচারের সময় পড়ে থাকলেন মর্মর মূর্তির মতো। বিমূঢ়, হতবাক হলেন চিকিৎসকরা। বললেন, 'এমন রোগী আমরা জীবনে দেখিনি!'

তিনি ইবাদাত ও ধ্যানে কাটিয়েছেন জীবনের বেশি সময়। চল্লিশ বছর টানা তাঁর কোনো তাহাজ্জুদ ক্বাজা হয়নি। মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন সিজদায়। বিত্‌রের নামাজ পড়ছিলেন। মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে, মেওয়াতীদের অনুরোধে মাওলানা মোহাম্মদের ইন্তেকালের পর নিযামুদ্দিন বাঙলাওয়ালী মসজিদে থাকার জন্যে তৈরি হলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ।

কিন্তু তিনি এখানে আসার আগে অসুখে পড়লেন। ফুসফুসের। কান্দালায় চলে গেলেন। আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একরাতে তাঁর অবস্থা এতো খারাপ হলো যে সব আশা মুখ থুবড়ে পড়ল। নাড়ির স্পন্দন নেই। গা ঠান্ডা হয়ে গেছে। তারপর আচমকাই সুস্থ হলেন তিনি। বিস্ময়কর ভাবে।

এবার চলে এলেন নিযামুদ্দিন।

তখন এখানে লোকজন ছিল না। মসজিদ ঘিরে দু'পাশে দ্রুত বেড়ে ওঠা ঘন গাছ পালা আর ঝোপ ঝাড়ে ভরা ছিল। মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হাসান রহমতুল্লাহি

আলাইহি বলেন, 'ছোট বেলায় এখানে ছিলাম। আমি বাইরে বেরুতাম এজন্যে যে হয়তো মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। কাউকে পেলে মনে হতো দামী কিছু পেতাম।

একটা পাকা মসজিদ, একটা ছাউনি, কয়েকটা থাকার কামরা, দক্ষিণে জিয়ারতের জন্যে সামান্য জায়গা-এই ছিল বাঙলাওয়ালী মসজিদ আর মাদ্রাসা।

মাদ্রাসার আয় এতই অল্প ছিল যে, মাঝে মাঝেই ছাত্র ও শিক্ষকদের অনাহারে থাকতে হতো। তবু তারা সবকিছু খুশি মনে মেনে নিয়েছিল। এমনও হয়েছে যে তাঁকে সরাসরি বলতে হতো। 'খাবার কিছুই নেই। যে থাকতে চায় সে থাকুক। আর চলে যেতে চাইলে যাক।'

কিন্তু যেত না কেউই। মাওলানার চরিত্র মাধুর্য এমনই অমোঘ আকর্ষণীয় ছিল যে খিদে, অভাব তাদের মনে দাগ কাটেনি।

অবশ্য মাওলানার মনে ভয় ছিল অন্য। তা হচ্ছে সাফল্য তো আসবে। কষ্টের পর আল্লাহ এটা দেন। তখন সেটা পথহারা করে দেবে নাতো?

মাদ্রাসার বাইরের চাকচিক্য আর অবয়ব নিয়ে মাওলানার কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি এ ব্যাপারে একবারে উদাসীন ছিলেন। এক সময় তিনি দিল্লীতে ছিলেন না তখন তাঁর বন্ধু, পুরোন ছাত্র হাজি আবদুর রহমান মাদ্রাসার লোকজনের জন্যে ক'টা কামরা তৈরি করলেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি সেজন্যে হাজি সাহেবের সাথে অনেকদিন কথা পর্যন্ত বলেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'উদ্দেশ্য তো শিক্ষা আর দীক্ষা। পাকা দালান হলো কিন্তু শিক্ষা নেই।'

একবার দিল্লীর কোনো এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহিকে অত্যন্ত বিপদ নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বললেন। সাথে দিলেন উপহার। একটা টাকার থলি। তিনি বললেন, 'দোয়া করবো। কিন্তু টাকার থলি নিয়ে যাও। টাকা দিয়ে দোয়া কিনতে এসো না।'

তিনি হাজি আবদুর রহমানকে বললেন, 'ঈমানী মেহনত অর্থ সম্পদের কাছে ঠেকা নয়। তা যদি হতো তবে সবচেয়ে বেশি ধনসম্পদ পেতেন নবীরা।'

পরম প্রভুর ধ্যানে

মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেকে আন্তরিক

ইবাদাতে মগ্ন রাখতেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় চেষ্টা করা ছিল তাঁর পূর্ব পুরুষদের অভ্যেস। নিযামুদ্দিনে থাকার সময় এটা তাঁর ভেতর জেগেছিল প্রবলভাবে। আত্মার শুদ্ধির জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নির্জনতা। কঠোর ইবাদাত, রিয়াজত আর মুজাহাদায় মেতে থাকতেন।

হাজি আবদুর রহমান বলেন, 'হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে তাঁর প্রিয় একটা জায়গা ছিল। 'আরব সারা' নামের তোরণের কাছে ছিল সেটা। এখানে চুপচাপ সময় কাটাতেন। গভীর ধ্যান আর দীর্ঘ সময়ের প্রার্থনায় চলে যেত সময়। জায়গাটা ছিল হুমায়ুনের সমাধি স্তম্ভের উত্তরে আবদুর রহিম খানখানা আর মির্যা মাজহার ঝানঝানির প্রাজ্ঞ আধ্যাত্মিক পরামর্শ দাতা সাইয়্যিদ নুর মুহাম্মাদ বাদাউনির স্মৃতিস্তম্ভের কাছে।

তাঁর দুপুরের খাবার ওখানে পৌঁছে দেয়া হতো। রাতের খাবার বাড়িতে এসে খেতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করতেন। হাজি আবদুর রহমান ও অন্য ছাত্ররা এখানে এসে নিয়ে যেতেন সবক। মাঝে মধ্যে তিনি চাক্কারওয়ালী মসজিদে এসে নামাজ পড়তেন।

পড়া দেয়া আর নেয়া ছাড়া খুব কম কথা বলতেন তিনি। খাবার দেরিতে এলে বিরক্ত হতেন না। খারাপ হলে দোষ ধরতেন না।

মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি নিযামুদ্দিনে আসার পর থেকে ফিরোজপুর বাসিরা নিযামুদ্দিনে বেশি বেশি আসতে শুরু করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে মেওয়াত সফরে যাবার অনুরোধ করতেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির এক বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল তিনি তাঁর আব্বা ও ভাই এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তাদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। মেওয়াতীদের অবিরত অনুরোধে একবার তিনি মেওয়াত যাওয়া ঠিক করলেন। প্রথম ফিরোজপুরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময় অধিকাংশ মেওয়াতবাসিদের কাছে ফিরোজপুরের একটা বিশেষ ঐতিহ্য ছিল। সেজন্যে ফিরোজপুরের ব্যাপারে কোন দ্বিমতই দেখা গেল না। হযরতজীর আসার খবর শুনে চারদিকে থেকে লোকজন এসে ভরে গেল। এই প্রথম মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি মেওয়াতে তাশরীফ নিয়ে যান। এক রাত সেখানে অবস্থান করেন। কয়েকটি অনুষ্ঠানে বয়ান করেন। এমনি করে হযরতজীর মেওয়াতে আসা যাওয়ায় মেওয়াতীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক

বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে বেশির ভাগ তিনি থাকতেন নূহ এলাকায়। পরে মেওয়াতের অন্য সব এলাকায় যান। মেওয়াতে উম্মতের দ্বীনহীনতা দেখে তাঁর মাঝে ক্রমশ চিন্তা ও ব্যথা বাড়তে থাকে। উম্মতের দরদ ও ব্যথা ভরা মন নিয়ে তিনি সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হিসেবে বেছে নিলেন তালীমকে (শিক্ষাকে)। সেজন্য তিনি কোরান শরীফ, প্রাথমিক মাসলা মাসায়েল শিক্ষার এবং উর্দু বই পড়ার জন্যে মক্তব খুলে দিলেন। তালিমের জন্য তাঁকে সীমাহীন কষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে হলো।। ধৈর্যের পাহাড় ছিলেন তাই বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। শিক্ষার কাজ অব্যাহত ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার্থীদের জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তাদের মধ্যে আগের সেই হিন্দুআনা চালচলন আর বেশভূষাই রয়ে গেল। তবু তিনি নিরাশ হলেন না।

ওয়াজ নসীহতের পথে

অবশেষে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ওই আগের পথ তালিম ঠিক রেখে সংশোধনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ওয়াজ, নসিহাতের পথ ধরলেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ওয়ায়েজীন, ওলামায়ে কেরামদেরকে সংগ্রহ করে তাঁদের জন্য ভাতা ঠিক করলেন। তাঁদেরকে মেওয়াতের নানান এলাকায় ঘুরে ঘুরে ওয়াজ নসিহত করার দায়িত্ব দিলেন। ওয়ায়েজীনে কেরাম হযরতজীর ইচ্ছা মতো বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে লোক জমা করে ওয়াজ নসিহত করতে থাকেন। তাতে কিছু ফল দেখা গেল। বস্তির অনেকে নামাজ পড়াও ধরল। ওয়ায়েজীনে কেরামের কাছে হযরতজী এলাকার অবস্থা শুনে খুশি হতেন।। কিন্তু কিছু দিন পর হযরতজী নিজে বস্তি ঘুরে ঘুরে দেখেন। ঘটনা পুরোপুরি উল্টো। কোথায় তাদের নামাজ কালাম? আগের মতই অবস্থা দেখে খুব ব্যথিত হলেন। দিনের পর দিন তাঁর উম্মতের সংশোধনের ও পরিবর্তনের ফিকির বেড়েই চলল। যখন হযরতজী উম্মতের দরদ ও চিন্তায় প্রচন্ড অস্থিরতায় দিন কাটাচ্ছেন তখন আগ্রার কাছে মালকান সম্প্রদায় থেকে শুদ্ধি আন্দোলন নামে এক ফেতনা শুরু হয়। 'শুদ্ধি আন্দোলনের চক্রে পড়ে অনেক মুসলমান মুরতাদ হতে শুরু করে। আসল ঘটনা হচ্ছে আগ্রার কাছে ওই মালকান সম্প্রদায় ছিল মুসলিম বংশধর। কিন্তু তাদের সামাজিক রীতিনীতি, চাল-চলন, বেশভূষা সবকিছু ছিল হিন্দুদের মত। তাদের মধ্যে মুসলমানী কিছুই ছিল না,

নামাজ কালামতো দূরের কথা তারা পবিত্র কালিমাটাও জানতো না। এমনকি তাদের নামগুলো পর্যন্ত ছিল হিন্দুয়ানি। ইসালামের কোন কথাই তাদের কানে পৌছেনি। এদেরকে পাশের হিন্দু ও তাদের স্ববংশীয় কিছু লোক যখন এই বলে পথভ্রষ্ট করতে লাগল যে, 'তোমরা আসলে হিন্দুদেরই বংশধর! তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের মতই পূজা পর্বে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু মুসলমান বাদশাহরা তাঁদেরকে জোর করে মুসলমান করেছিল। নইলে এখনো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন ফারাক নেই। তোমাদের নাম-ধাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সবই আমাদের মত। তফাৎ শুধু তোমরা বছরে দু'বার ঈদ ও একবার মুহররাম পালন করো । এগুলো ছেড়ে দাও। তাহলে আগের মতই আমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাব।' হিন্দুদের এই সব ধোঁকার কথা শুনে মুসলমান মালকান গোত্রের অনেকে মুরতাদ হলো। এই জঘন্যতম দ্বীনি দুর্দশায় ওলামায়ে কেরাম দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে প্রত্যেকে নানাভাবে চেষ্টা করে যথেষ্ট লোককে মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

মেওয়াতবাসিদের জীবন-যাপন পরিস্থিতিও ছিল কিছুটা এই মালকান সম্প্রদায়ের মত। কাজেই মালকানদের মত এদেরকেও যদি মুরতাদ করার চেষ্টা চলে তবে কোন রকম সন্দেহ ছাড়া খুব সহজেই এরা পরিবর্তন হবে। এই ভয়ে চিন্তা করতে করতে হযরতজী অস্থির হয়ে নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেন। সারাক্ষণ অস্থির অধীর দিন কাটাতে থাকেন। রাতের পর রাত কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। এত কিছুর পরেও এসলাহের পথ কোনটি তখনও বুঝতে পারেননি। আর এর আগে সব পথেই তিনি চেষ্টা করে তার ফলাফল দেখেছিলেন। সত্যিকার ফল পাননি। ক্রমশ দ্বীনি দূরাবস্থা আরো বাড়ছে দেখে তিনি উম্মতের চিন্তা বেদনায় অকুল পাথারে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার ফিরোজপুরের কিছু লোক হযরতজীর খেদমতে এসে বলল, 'হযরত, আপনার বড় ভাই যদ্দিন বেঁচে ছিলেন নিয়মিত আসতেন। তখন এলাকায় ক্রমশ দ্বীনি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া মুন্সি নুর বক্স সাহেবের প্রচেষ্টায় দিন দিন সেখানে ইল্‌ম ও আমলের উন্নতি হচ্ছিল। তাঁদের ইন্তেকালের পর প্রতিনিধি হিসাবে আপনি আমাদের এলাকায় গেলে মাত্র দু' একদিন থেকে চলে আসেন। এইজন্য এলকাবাসি ফয়েজ বরকত পাবার পুরো সুযোগ পায় না। তাই আবার তাদের মধ্যে দ্বীনি অবনতি শুরু হয়েছে। কাজেই দ্বীনের উন্নতির জন্য ফিরোজপুরে এসে দয়া করে দশ বারো দিন থাকলে ভালো হয়।

মানুষ মানুষের জন্যে

মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির চিন্তা-ভাবনা একটি মহল্লা নয় সারা বিশ্ব। ফিরোজপুরের অধিবাসীরা কয়েক দিনের জন্য দাওয়াত দিলে তিনি উত্তরে বললেন, শুধু ফিরোজপুর নয়, আমি গোটা বিশ্বের চিন্তায় চিন্তিত। সেক্ষেত্রে কেবল তোমাদের বস্তিতেই এতদিন কি ভাবে থাকি? তাছাড়া তোমরা বেশ লেখাপড়াও শিখেছ। অন্য এলাকার তুলনায় তোমাদের বস্তিতে যথেষ্ট দ্বীন ও দ্বীনি ইলম শেখার জন্য মাদ্রাসা রয়েছে। তোমাদের এলাকায় তোমরাই মেহনত করতে থাক। পরামর্শ ইত্যাদির জন্য আমি মাঝে মাঝে আসব। হযরতজীর কথা শুনে তাঁরা আরজ করল, 'হযরত আমরা চেষ্টা করি কিন্তু তেমন কোন ফল দেখিনা।'

হযরতজী বললেন, 'আচ্ছা বলতো তোমরা কি চেষ্টা করো?'

তারা বলল, 'ছোটদেরকে আমরা দ্বীনি মক্তবে পাঠাই। হুজুর, আমরা বড়দেরকে ডেকে ডেকে নামাজে আনি।'

হযরতজী বিস্ময়ে চমকে উঠে বললেন, 'তোমরা কেমন করে বলতো শুনি?'

তারা বললো, 'আমরা জামাতবন্দি হয়ে মানুষের কাছে যাই। উৎসাহ দিয়ে তাদেরকে (নামাজের জন্য) মসজিদে আনি।'

তাদের কথা শুনে হযরতজী বললেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের কাজ দেখব। কবে হয় বলো। সেদিন তোমাদের ওখানে যাব।' তারা বললো, 'হযরত, এর জন্যে নির্দিষ্ট কোন দিন নেই। অবস্থা বুঝে যে কোন একদিন পাঁচ-ছ'জন মিলে করে নেয়া হয়। আপনিই বলুন হুজুর; ঠিক কবে করা হবে।'

দিনক্ষণ ঠিক হলো। ফিরোজপুরের সবাই খুশি মনে হযরতের দরবার থেকে চলে এলো। এলাকায় এসে সবাইকে হযরতজীর আসার খবর শোনালো। হযরতের অপেক্ষায় সবার কাছে প্রতিটি দিন দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে সেই দিনটি এলো। ভোর হতে সবাই রাজপথে পড়ে রইলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হযরতজী সেই পথে না এসে সোজা নূহ এলাকায় গিয়ে পৌঁছুলেন। হযরতকে না পেয়ে আসরের সময় সবাই পরামর্শ করলেন এখন কি করা যায়। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর কেউ বললেন হযরতজী হয়তো অন্য রাস্তায় চলে গেছেন। নুহ হয়ে ফিরোজপুর আসতে পথ ভুলে কোথাও রয়ে গেছেন। এই

আশায় আবার সবাই পরামর্শ করলেন। দু'জনকে খুব তাকিদের সাথে এই বলে নূহ পাঠালেন যে হযরতজীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই তোমরা একজন চলে আসবে। হযরতের খবর পেলে আমরা পালকি, রথ ইত্যাদি নিয়ে অভ্যর্থনার জন্য নুহের দিকে এগিয়ে যাব। আর হযরত যদি না এসেই থাকেন তখন তোমরা দুজনেই ফিরে এসে খবর জানাবে। দু'জন যখন নুহ পৌছুল তখন হযরতজী নূহ এর জামে মসজিদে ছিলেন। হযরতজীকে ফিরোজপুর বাসিদের দিনভর অপেক্ষার কথা শোনালেন। নিজেদের আসার উদ্দেশ্য বললেন। হযরতজী বললেন, 'আমার নিয়তই ছিলো ফিরোজপুর যাওয়া । কিন্তু ভুলে এখানে এসে পড়েছি। এখনও আমি ওখানে যেতে তৈরি।' হযরতজীর কথা শেষ হতে নূহবাসি দু'জনকে অনেক অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'হযরতকে আজ আমাদের এখানেই থাকতে দাও। কাল সকালে আমরা নিজেরাই তাঁকে ফিরোজপুর পৌছে দেব।' নুহবাসীদের অনুরোধে হযরতকে সেদিনের জন্য নূহে রেখে আসতে রাজী হলেন। পর দিন খুব ভোরে ফিরোজপুর বাসীরা হযরতকে এগিয়ে আনতে পালকি ও রথ নিয়ে নূহে গেলেন। হযরতজী নূহের বিশিষ্ট বুজুর্গানেদ্বীনসহ তাদের পালকি চড়ে ফিরোজপুর এলেন।

এই ঘটনাটি ঘটে ইংরেজী ১৯২৬ বা১৯২৭ সনে। হযরতজী ব্যাকুল হয়ে বার বার বলছিলেন, 'ভাই গাশ্ত কর, ভাই গাশ্ত কর।' কিন্তু 'গাশ্ত' দেখা হলেই হযরতজী চলে আসবেন এই ভয়ে এলাকাবাসি গাশ্ত করতে দেরি করছিল। হযরতজীকে সেদিন তাদের কাছে রাখার জন্যে দেরি করে গাশ্ত করলেন। মাগরিবের পরে। হযরতজীও গাশ্তে হাজির হলেন। গাশ্ত করে কয়েকজন বে-নামাজীকে তারা মসজিদে নিয়ে এলেন। এরপর এশার নামাজ হল। নামাজ বাদ হযরতজী বয়ান করেন। শেষে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বসিয়ে বললেন, 'তোমাদের গাশ্ত আমার খুব ভালো লেগেছে।' অবশ্য আমি এতে কিছু ভুল দেখতে পেয়েছি। সেগুলো ঠিক করে দিচ্ছি। তোমরা সেভাবে গাশ্ত করবে। প্রথম জামাতবন্দি হয়ে একজনকে জিম্মাদার ঠিক করে নেবে। এরপর এক জনকে কথা বলার জন্যে ঠিক করবে। জামাতের পক্ষে সেই কথা বলবে। অন্য সবাই জিকির করতে থাকবে। প্রথম তারা অন্য বস্তিতে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। পরে হযরতজীর উৎসাহ ও অনুরোধে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। হযরতজী তাদেরকে অনেক দোয়া করলেন। প্রথম গাশ্তে নামাজের

দাওয়াত চলত। হযরতজী বললেন আগামী থেকে গাশ্তে গিয়ে তোমরা কালিমা শুনবে ও শোনাবে।'

ফিরোজপুরের ওই সাথীরা তাঁদের আশপাশে বিভিন্ন এলাকায় গিয়েও গাশ্ত করতেন। কিন্তু নির্ধারিত কোন দিন বা নির্দিষ্ট কোন নিয়ম ছিল না। সুবিধা মতো যে কোন একদিন করে নিতেন। কখনও চান্দিনী, কখনও গাছিগা এলাকা ছিল গাশ্তের ময়দান। এমনিভাবে ফিরোজপুর ও আশপাশে মেহনত শুরু হলো। বেশ কিছুদিন পর একবার হযরতজী ফিরোজপুর তাশরীফ এনে দু'দিন অবস্থান করেন। গাশ্তের ব্যাপারে প্রশংসা করেন। বলেন 'তোমাদের কাজ আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। কতই না ভাল হত তোমরা যদি বস্তিতে আর পাড়ায় গিয়ে কালেমা নামাজের দাওয়াত শুরু করতে। আমি আশা করি তোমাদের এই মেহনত মানব জাতির খুব উপকার বয়ে আনবে।'

তুমি আঁধার মনের বনে ছড়াও আলো!

আল্লাহপাক যাকে দিয়ে কাজ নিতে চান জন্ম সূত্রেই তাকে দুর্লভ সব গুণাবলীতে ভূষিত করেন। যার জন্য ছেলেবেলায়ই তার সফল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দীপ্ত আভা চোখে পড়তে থাকে। তিনি সবার মাঝে থেকেও আলাদা থাকেন। এ অবস্থা পুরোপুরি ফুটে ওঠে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনে। পরে উম্মতের পথ প্রদর্শকদের মধ্যেও কিছু দেখা যায়।

হযরতজীকে ছোটবেলা দেখে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন,'এই বাচ্চার মধ্যে আমি সাহাবায়ে কেরামের সৌরভ পাচ্ছি।'

কান্দালার পীর পরিবারে কারামত সম্পন্ন এক বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন (যার সম্পর্কে 'শায়েখে কান্দালা' নামক গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে)। সবাই তাঁকে আম্মিবি বলে ডাকত। ছোটবেলা মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন তাঁর কাছে যেতেন তখন তিনি বলতেন, 'সৌভাগ্যবান ইলিয়াস বুঝি এখানে এসেছে? আমি তার মাঝে সাহাবায় কেরামের খুশ্‌বু পাচ্ছি। সেই পীর মহিলা আম্মিবি শেষ বয়সে অন্ধ হওয়াতে কাউকে আর দেখতেন না। তখনও হযরতজীকে চিনে নিতেন। অথচ অন্যদের বেলায় তাদের নাম জেনে চিনতে হত।

হযরতজী মেওয়াতবাসীদেরকে বাড়ি থেকে এনে জামাতবন্দি করে নানান এলাকায় পাঠাতেন। তখন অনেক ওলামায়ে কেরামের মাঝে আলোচনা হলো যে মাওলানা ইলিয়াস এটা কি শুরু করলেন? ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শীতের মৌসুমে একবার হযরতজী দু'মাসের জন্য ষাট জন সাথীদের দিল্লীর শাহজাহান মসজিদে এনে (জামে মসজিদ) জামাতের দিক ঠিক করে দেন। শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ আহমাদ মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি জামাতকে হেদায়াত দিয়ে দোয়া করলেন। কিছু জামাত কর্ণাল পানিপথের দিকে কিছু সাহারানপুরের আশপাশে আর কিছু কান্দালার চারপাশের এলাকায় পাঠালেন।

'সময় শেষ হলে তোমরা নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হবে। আমি এসে তোমাদেরকে ফিরতি হেদায়াত দিয়ে মুসাফাহ করে বিদায় দিব।'

কান্দালার জামাতকে সেখানেই হাজির হতে বললেন। সময় পুরো হলে পাঠানো জামাত তিনটি কান্দালাতেই এক হলো। তাদেরকে দেখে খুবই খুশি হলেন হযরতজি। কান্দালার নিজের আত্মীয়দের বলে দাওয়াত করে খাওয়ালেন। তাদের কাজের অনেক প্রশংসা করার পর বললেন, 'ভাই, তোমরা মোট ষাট জন সাথী। মাত্র আট দশ দিনের জন্য আমাকে এমন আট জন সাথী দাও যাদেরকে যেখানে পাঠানো হোক সেখানেই যেতে তৈরি থাকবে।'

দীর্ঘ দু'মাস পরে সবাই বাড়ি ফেরার পথে। তাই কেউ রাজি হলো না। হযরতজী দু'দিন পর্যন্ত উৎসাহ দিতে থাকলেন। কখনো মাওলানা এহতেশামুল হাসান সাহেবকে দিয়ে বলাতেন। তাঁদের দুজনের উৎসাহে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন ঈসা ফিরোজপুরী নাম পেশ করেছিল। হযরতজী সীমাহীন খুশি হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর সবাইকে এই অল্প বয়স্ক ছেলেটির আশ্চর্য ত্যাগের কথা বলে বললেন, 'একে দেখেওকি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ছেলেটি বয়সে তোমাদের ছোট অথচ সাহসে সবার উপরে।'

ছেলেটির দেখাদেখি নম্বরদার মেহরাব খান ফিরোজপুরী, হাজী সাঈদুল্লাহ রায়সিনাবী, তারপর মৌলভী শাবী, আবদুল্লাহ সাকা ফিরোজপুরী আল্লাহর রাস্তায় আবার বের হতে রাজী হলেন। ফিরোজপুরের আরো একজন অল্প বয়স্ক ছেলে ছিলেন। তাঁর নাম ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত হাসান খান হবেন। জামাতটি ছিল মোট আটজন নিয়ে। মুন্সি নাসরুল্লাহ খানকে আমীর ও নম্বরদার মেহরাব খানকে তাদের জিম্মাদার করে অনেক দোয়ার পর নিচের লেখা হিদায়াত দিয়ে রওয়ানা করে দিলেন।

পরশ পাথরের কাছে প্রথম

হযরতজী বললেন, 'তোমরা সরাসরি থানাভবনে থেকো না। থানাভবনের আশে পাশেই কাজ করবে। এমন প্রাণান্ত মেহনত করবে যাতে তার খবর থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে পৌঁছে যায়। যেন তিনি নিজেই তোমাদের কাছে ডেকে নেন। থানাভবনের আশে পাশে মাত্র আট দিন কাজ করবে। যদি এই আট দিনের মধ্যে থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির পয়গাম পেয়ে যাও তবে থানাভবনে তাঁর খেদমতে হাজির হবে। নইলে সেখান থেকেই ফিরে নিযামুদ্দিন চলে আসবে। হযরতের পয়গাম পেলে খুব দোয়া ও ইস্তেগফার পড়তে পড়তে সোজা তার খানকায় পৌঁছুবে। পূর্ণ আদব ও ইহতেরামের সাথে সেখানে ঢুকবে। হযরত যখন তোমাদেরকে ডেকে আমাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন তখন সঠিক ভাবে, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায় কাজের নিয়মগুলো বলবে। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি যদি জানতে চান তোমরা এখানে কতদিন থাকবে তখন বলবে - তিন দিন। এর পর যদি তিনি বেশি থাকতে বলেন তখন বলবে, যতদিন হযরত থাকতে বলেন ততদিন আমরা তৈরি আছি। খাবার কথা জিজ্ঞেস করলে পরিষ্কার ভাবে বলবে আমরা নিজেরা রান্না করে খাই। থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি যদি খানা খাওয়াতে চান তবে পূর্ণ আনন্দ ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবে। কারণ বুজুর্গানে দ্বীনের শুকনা রুটি বড় বড় দুনিয়াবী নেয়ামতের চেয়ে ভালো।'

এরপর হেদায়াত ও উপদেশ দিয়ে হযরতজী দোয়ার মধ্যে এমন কাঁদলেন যে উপস্থিত সবাই তাতে কেঁদে আকুল হলেন। দোয়ার পর অভ্যেস মতো কান্দালার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত হযরতজি নিজ জামাতকে এগিয়ে দিতে এলেন। পথে চলার সময়ও হযরতজী জামাতকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। চলার পথে মাঝে মাঝে হযরতজীর চেহারায় সীমাহীন খুশির ছাপ ফুটে উঠেছিল। একই সাথে মাঝে মাঝে এমন কঠিন চিন্তার ছায়া ফুটে উঠছিল যার জন্যে হযরতজীর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। অনেক দূর পর্যন্ত জামাতকে এগিয়ে দিলেন কান্দালার দিকে। ফেরার পথে বার বার আশা নিরাশার দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে জামাতকে দেখছিলেন।

জামাত থানাভবনের উদ্দেশে চলেছে। ভয় আশা নিরাশায় দুলছে সাথীদের মন। সফর ছিল পায়ে হাঁটার। মাগরিবের সময় জামাত মাত্র শামেলী পৌছুলো। শীতের মৌসুম তাই পরামর্শে সেদিন শামেলীতেই থাকার সিদ্ধান্ত হলো। সেখানে গাশ্‌ত হলো। লোকজন এলো। অল্প বয়ানের পর তাশকীলও হলো। এলাকার কাজের জন্যে তৈরি হল জামাত। জামাত সেখানে রাতে থেকে পরের দিন সকালে আবার রওয়ানা হলো। কোথায় যাবে কিছুই ঠিক করতে পারেননি। চলতে চলতে অবশেষে কিটরি পৌছুলে সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত হলো। এই প্রথম জামাত সেখানকার মসজিদে ঢুকলো। আসরের নামাজের সময় অজু সেরে তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ পড়ে নিলেন। জামাত পরামর্শ করছে এর মাঝে আজান হয়ে গেল। একজন সাথি ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন। ইমাম সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মুসুল্লি বেশিই আহলে হাদীস। নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলল। নামাজের পর একজন বিশিষ্ট মুসুল্লি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মসজিদে এসব বিছানাপত্র কার?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'মেওয়াতের কিছু লোকের। ওরা নিযামুদ্দিন থেকে জামাতে এসেছে।'

জামাতের নাম শোনা মাত্রই লোকটি গর্জে উঠে বলল, 'কিসের জামাত! কি কাজে এসেছে এখানে? তাদের কোনই দরকার নেই। গিয়ে বলেন এখান থেকে চলে যাক।'

লোকটির চেঁচামেচি শুনে সাথিরা ঘাবড়ে গিয়ে ইশারায় আমির সাহেবের সাথে পরামর্শ করতে চাইলেন। এমন সময় আমির সাহেব উঠে গর্জনকারীর সাথে মুসাফাহা করে জামাতের উদ্দেশ্য খুলে বললেন। 'গাশ্‌ত করে লোকজন মসজিদে আনি। কালেমা শিখাই। নামাজ পড়তে বলি। নিজেরাই রান্না করে খাই।'

আমির সাহেবের কথা শুনে সে লোক গাশ্‌ত ও বয়ান করার সুযোগ দিতে রাজি হলেন। কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে বললেন। আল্লাহর পাকের মর্জি সে সময় এতটুকুও অনেক। সবাই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন। পরে সাথীরা রাগী লোকটি সম্পর্কে ইমাম সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'উনি নওয়াব আবদুল করিম সাহেব। ওনারা চার ভাই। দুই ভাই আহলে হাদীস। নওয়াব সাহেব সবার বড়। বাকি ভাই সবাই তাকে খুবই সম্মান করেন। সকলেই দ্বীনদার ও নেক। নামাজ রোজায় খুবই মজবুত।

গাঁয়ের নওয়াবী তাদের। সব কিছুর দায়িত্ব নওয়াব আবদুল করিম সাহেবেরই হাতে। আবদুল করিম সাহেবের ছোট ভায়ের নাম মনে নেই। মেজ ভায়ের নাম আবদুল মজিদ খান। এরা দুজন হানাফী। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ। এশার আগে স্থানীয় কিছু সাথীদেরকে নিয়ে গাশ্‌ত হল। বেনামাজির সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু ঈমান-আমলের কথা শুনে তারা মসজিদে এলো মাগরিবের জামাতে কোন মতে টেনে টুনে এক কাতার মুসুল্লী হলো। গাশ্‌ত হওয়ায় এশার জামাতে মসজিদের ভেতর ভরে বারান্দায়ও জায়গা হলো না, রাস্তাও ভরে গেল। এশার নামাজের দোয়ার পর এলান (ঘোষণা) দেয়া হলো।

দোয়ার পর আবদুল করিম খান বললেন 'আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনাদের কাজ আমার খুবই ভাল লেগেছে। আমি চাই আমাদের সব চাষী নামাজী হয়ে যাক। কিন্তু আমাদের কোন পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। আপনাদের এই নিয়ম দেখি খুবই কাজের! আপনারা আমাদের এখানেই থাকুন। আমি বা আমার ভাই অথবা আমাদের ছেলেদের মধ্যে থেকে যে কেউ একজন আপনাদের সাথে সব সময় থাকব। আপনাদের খাওয়া দাওয়ার চিন্তা আমরাই করব।'

জামাতের তরফ থেকে খাওয়ার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করা হলো। ওই এলাকায় মাত্র আটদিনের কাজের কর্মসূচী তৈরি করা হলো। গোটা নওয়াব শাসিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে জামাত কাজ করলো। প্রত্যেক গ্রামেই মুসল্লিতে মসজিদ ভরে যাচ্ছিল। খোদা পাকের মহিমা বোঝার সাধ্য কার? নওয়াব সাহেবের হানাফী দুই ভাই (আবদুল হামিদ খান ও আবদুল মজীদ খান) প্রতি দিন থানাভবনে হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে গিয়ে ফয়েজ হাসিল করতেন। জামাত যাওয়ার পর থেকে দুজনেই রোজ হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে জামাতের খবরাখবর শোনাচ্ছিলেন। অপরদিকে জামাতের কাছে এসে জামাতের কাজের প্রতি হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির খুশির কথা শোনাচ্ছিলেন। এক সপ্তাহ আগে শামেলীতে জুমা পড়ে ওই দিনই জামাত এই কাটরি এলাকায় এসেছিল। তার পরদিন শনিবার থেকে পরের এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রোগ্রাম মাফিক জামাতের কাজ শেষ হয়। এই বৃহস্পতিবার রাতেই থানাভবন থেকে নওয়াব আবদুল হামিদ খান সাহেব সংবাদ নিয়ে এলেন যে, হযরত থানভী জামাতকে কাল থানাভবন গিয়ে জুমা পড়তে বলেছেন।

সকলে যেন ঈদের চাঁদের খুশির খবর পেল। আনন্দে রাত কাটিয়ে দিলেন। বেশিরভাগ সাথীই নামাজ, তেলাওয়াত, তাসবীহে লেগে গেলেন। সেদিন সূর্যও যেন উঠতে দেরি করলো। এশরাকের ওয়াক্ত হলো। এশরাক পড়েই জামাত থানাভবনের পথে রওয়ানা হলো। আনন্দে সাথীদের যেন পায়ের মাটি সরে যাচ্ছে। ভোরে থানাভবন গিয়ে সোজা খানকায়ে এমদাদিয়ায় হাজির। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির খাদেম জামাতের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা স্বাগতম ও অভ্যর্থনা জানিয়ে উত্তর পাশের কামরায় জামাতের সামানাপত্তর রাখলেন। এরপর কুলুখ, এস্তেঞ্জা, গোসলখানা দেখিয়ে বললেন আপনারা প্রয়োজন মিটিয়ে নিন। এরমাঝে হযরত মাওলানা জাফর ওসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি এলেন। জামাতের লোকেরা তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। তিনি মেওয়াত ও নিযামুদ্দিনে অনেকবার সফর করেছেন। হযরত মাওলানা ওসমানী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি সাথীদের থাকা, খাওয়া, আর কাজের নিয়ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমির সাহেব আর মেহরাব খান দুজনে মিলে কাজের উসুল বললেন। শোনার পর ওসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এভাবেই থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতেও তোমাদের উসুলগুলো হুবহু, নির্ভয়ে স্পষ্টভাবে পেশ করবে। ভুল হলে আমি পাশ থেকে মনে করে দেব। এবার তিনি জামাতকে থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিতির আদব ও উসুল শিখিয়ে চলে গেলেন।

লোকজনে মসজিদ ভরে গেল। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহিও এলেন। সাথীদের দিকে এক নজর দেখে মিম্বরে বসলেন। মুয়াজ্জিন খুৎবার আজান দিল। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি খুৎবা ও নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে এক লোক এসে বলল হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি জামাতের সাথীদের মনে করেছেন। সাথীরা হযরতের খেদমতে হাজির হলো। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি মুসাফাহা করলেন। বললেন পরদিন ফজরের পর কথা বলবেন।

হযরত মাওলানা ওসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি সাহেবের দীর্ঘ বয়ানের ফলে রাত বারটা বেজে গেল। দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাথীরা গাশ্ত ও বয়ানে মশগুল ছিলেন আর হযরত মাওলানা ওসমান সাথে থাকায় রান্না করতে পারেননি। সারাটা দিন না খেয়ে জীবনের খিদে যেন সেদিন এক সাথে পেয়েছিল। ফেরার পথে হযরত মাওলানা আগে আগে ছিলেন আর সাথীরা

পেছনে। চলতে চলতে গোপনে পরামর্শ করে দুই সাথীকে খাওয়ার কিছু আনতে বাজারে পাঠালেন। এমন কি ছোলা বুট পেলেও আনতে বললেন। সবার মাঝে মাত্র দু'জন বের হওয়ায় কেউ টের পেল না। হযরত মাওলানা ওসমান রহমতুল্লাহি আলাইহি জামাতকে মৌলভী নাসির আহমদ সাহেবের কামরায় পৌছে দিয়ে (সেখানে জামাত থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল) বাড়িতে ফিরে গেলেন। এলাকার সাথীরাও সকলে চলে গেলেন। এদিকে সাথী দু'জন বাজারে কিছুই পেল না। শেষে একটা চালের উপর দিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে তার বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নেড়ে ছোলা বেপারীকে ডাকলেন। গভীর রাতে দরজায় শব্দ শুনে তারা চিৎকার করতে চাচ্ছিল। কিন্তু সাথীরা টর্চ মেরে বললেন, 'আমরা চোর নই, জামাতের লোক।'

বাড়িওয়ালা দিনে তাদেরকে গাশ্ত করতে দেখেছিল। ওই এলাকায় নিয়ম ছোলা ব্যাপারীরা ছোলা বুট ভাজার সাথে চিড়েগুড় রাখা। ছোলার ব্যাপারীর কাছ থেকে ছোলা ও কিছু চিড়েগুড় কিনে কামরায় চলে এলো। সাথীরা আনন্দ প্রকাশ করল তাদের দেখে। তখন গভীর নিথর নিস্তব্ধ রাত। একটি প্রাণীরও কোথাও কোন চিহ্ন নেই। শুধু দারোয়ান দরজায় পড়ে গভীর ঘুমে। তবুও সাবধানতার জন্য দরজা জানালা বন্ধ করে আস্তে আস্তে চিড়েগুড় খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমির সাহেব এ ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করতেও নিষেধ করেছিলেন। যেন কেউ জানতে না পারে আমরা অল্প কিছু খেয়ে রাত কাটিয়েছি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে সব সাথী তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে গেলেন। কামরাতেই দোয়া, তাসবিহ, তাহলীল সেরে ফজরের নামাজ হযরত থানবীর পিছনে পড়লেন। নামাজ শেষে হযরত থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহির অন্য লোকও এসে বসল। থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবকে বললেন, 'জামাতের কাজ কেমন দেখলে?'

তখন হযরত মাওলানা ওসমান সাহেবের চোখে প্রচন্ড বেদনায় অশ্রু নেমে এলো। কোন মতে নিজেকে সামলে এলাকার দ্বীনি অবক্ষয় আর এ কাজের দ্বারা তার উপকারের প্রত্যক্ষ ফলাফল বর্ণনা করলেন।

হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি জামাতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের গতরাত কি হালে কেটেছে?'

একজন সাথী আরজ করল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় ভালই কেটেছে।'

হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহি স্থানীয় লোকদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে জামাতকে চা পান করাবে?'

মৌলভী নাসির আহমাদ সাহেব বললেন, 'জ্বি হুজুর, অনুমতি পেলে আমি পান করাবো।'

হযরত থানভী বললেন, 'শুধু চা নয় সাথে নাশতাও হতে হবে।'

নাসির আহমদ সাহেব বাড়ি গিয়ে চা ও ঝুড়ি ভর্তি টাট্‌কা বিস্কুট নিয়ে এলেন। সাথে কিছু পেয়ালাও নিয়ে এলেন।

হযরত বললেন, 'দস্তরখানে বিস্কুট ঢেলে দিয়ে পেয়ালা ভরে চা দাও।'

হযরতের নির্দেশ মতো বিস্কুট ও চা ভর্তি পেয়ালা সাথীদের সামনে রাখা হল। সাথীরা সকলে চুপ চাপ বসে রইলেন। তাদের সংকোচ করতে দেখে হযরত বললেন, 'ভাই আমার ভুল হয়েছে। নিজেদের খানা খাওয়া যে তোমাদের নিয়ম সে কথা আমি পুরোপুরি ভুলে গেছি। আমি নিজেই নিয়ম মেনে চলি। নিয়ম মেনে চলা জরুরী মনে করি। খুবই ভাল কথা যে তোমরা নিজেদের উসুলের পাবন্দি করেছ। মৌলভী ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে কি কোনো উসুল রেখেছেন?'

আমিরে জামাত- যে কাজের জন্যে আমরা ঘরবাড়ি ছেড়েছি সে কাজে যদি কেউ নগদ বের হয়।

হযরত থানভী- কত সময় তোমরা চাও?

আমির-তিন চিল্লা।

হযরত থানভী- যদি তিন চিল্লা না দিতে পারে?

আমির-তবে বিশ দিনের জন্য বের হবে।

হযরত থানভী-কত দিন দিলে তোমরা দাওয়াত কবুল করো?

আমির-তিন দিন।

হযরত থানভী-যদি কেউ তাও না পারে?

আমির-চব্বিশ ঘন্টা আমাদের সাথে থাকবে।

হযরত থানভী- এতটুকুও যদি সম্ভব না হয়?

আমির- আমরা তার মাজুরীকে দেখব। যদি প্রকৃত শরিয়ত সম্মত মাজুরী

হয়ে থাকে তবে সুস্থ হবার পর বের হবার পাক্কা এরাদা করবেন। বের হওয়া পর্যন্ত একাজের জন্য অন্তর দিয়ে দোয়া করতে থাকবেন।'

শুনে হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি খুশি হয়ে বললেন, 'আমার দিলে চায় যে আমি আপনাদের মেহমানদারী করি। কিন্তু এমন মাজুর হয়ে আছি যে ঘর থেকে মসজিদে আসাটাও অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ওজর আপনাদের দৃষ্টিতে যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে আমার দাওয়াত কবুল করুন। আর যদি প্রকৃত ওজর না হয়ে থাকে তবে আপনাদের দাওয়াত না কবুল করার প্রতিও আমি খুশি।'

হযরতের এ বাণী শুনে জামাতের সাথী সবাই কাঁদতে লাগল। আমির সাহেব অশ্রুভেজা চোখে বললেন, 'হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "আল্লাহওয়ালাদের দাওয়াত অমূল্য মনে করে সর্ব ক্ষেত্রেই কবুল করবে। তাদের দস্তরখানার শুকনো রুটিও দুনিয়ার বড় বড় নেয়ামাতের চেয়ে বেশি বরকতময়। বরং তাদের দাওয়াত ভাগ্যে জোটায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। সৌভাগ্য ও বুজুর্গদের অনুগ্রহ মনে করবে"।'

আমির সাহেবের কাছে হযরতজীর এই কথা শুনে হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির চেহারায় খুশির আভা দেখা গেল। বারবার তিনি বলছিলেন, 'মৌলভী ইলিয়াস নিরাশাকে আশায় পরিবর্তন করেছে।' হযরত বললেন, 'এই চা ও বিস্কুট আমার প্রিয় মৌলভী নাসির আহমাদ এনেছে। আমি এটা খেতে তোমাদেরকে অনুরোধ করছি। আর আমার পক্ষ থেকে চার বেলা খাবার দাওয়াত থাকল। দুইদিন দুপুরে ও দুইদিন রাতে। নাশতার ব্যাপারে তোমাদের ইচ্ছা।'

তারপর মসল্লিদের দিকে লক্ষ করে বললেন, 'কেউ যদি দেখতে চান সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন তবে ওনাদের দেখে নিন। একটু থেমে বললেন, 'একটা কথা বাকি রয়ে যাচ্ছে। তা হলো তোমরা থানাভবনে কতদিন থাকবে?'

আমির সাহেব বিনীতভাবে বললেন, 'হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "থানাভবনে তিনদিন থাকতে। কিন্তু যদি হযরতের পক্ষ থেকে বেশি থাকার হুকুম হয় তবে হযরত যতদিন বলেন থাকবে"।'

শুনে তিনি আরো খুশি হয়ে বললেন, 'আমার থানাভবন এলাকায় বায়ান্ন টি মসজিদ আছে। কাজেই কমপক্ষে এখানে আট দিন থাকতে হবে।' জামাতের

সাথীরা খুশি মনে রাজী হয়ে গেলেন। এবার অনেক দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যার দ্বারা কাজ নিতে চান, তার দ্বারা করে নেন। এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ মাওলানা ইলিয়াসের ভাগে পড়েছে। এ মেহনত খুবই উঁচু কাজ। আমার আশা হয় এ মেহনত দ্বারা সত্যিই উম্মত উপকৃত হবে। আল্লাহ কবুল করুন, বরকতময় করুন, বরকতময় করুন। সব রকম ফেৎনা ও অমঙ্গল থেকে হেফাজত করুন।'

এরপর হযরত মাওলানা থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি জাফর আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, 'জামাতের আট দিনের প্রোগ্রাম বানিয়ে দিয়ে নিজে জামাতকে নুসরত করবে।' মজলিশের সবাইকে লক্ষ করে বললেন 'তোমরাও সবাই জামাতের সাথে বেশি বেশি সময় কাটাতে চেষ্টা করো।'

হযরত মাওলানা জাফর আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এলাকার মসজিদ গুলোর গাস্ত ও তালীমের সময় ঠিক করলেন। গোটা থানাভবন এলাকায় আট দিন ধরে মেহনত চললো। চারদিকে জামাতের চলা ফেরা চলছে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেও নির্দিষ্ট সময়ে জামাতের কাছে গিয়ে কাজের বিবরণ শুনতেন। অনেক দোয়া করতেন। আট দিনের মাথায় জামাতের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার দিলের তৃপ্তি মেটেনি, তোমাদেরও তো দুনিয়াবী কাজ রয়েছে। পারিবারিক ঝুট ঝামেলার সাথে তোমরাও জড়িত। এই জন্য খুশিতেই তোমাদের বিদায় দিচ্ছি। যদি যাওয়ার পথে রামপুর মনিহারান এলাকায় কিছু কাজ করে যাও তাহলে খুবই ভাল হয়। সেখানে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ কিছু লোক আছে।' সাথীরা সেখানে যেতে রাজী হলেন। অনেক দোয়া দিয়ে থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবার থেকে বিদায় নিয়ে জামাত মনিহারানে দুইদিন কাজ করে নিযামুদ্দিন ফিরে এলো।

সত্য সমাগত

একবার শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার চাচাজান প্রথমে তাবলীগ শুরু করেন। আমিও আনন্দে চাচার সাথে মেওয়াতের এস্তেমায় শরীক হই। কখনও পরামর্শে ডাকলে খুব

আত্মবিশ্বাসের সাথে পরামর্শ দিই সত্যি, কিন্তু কাজের (তাবলীগের) ব্যাপারে আমার মন তেমন পরিষ্কার ছিল না। চাচাজান অনেক ভাবে আমাকে কাজের গুরুত্ব বোঝাতেন, কিন্তু আমার মনের কোন পরিবর্তন পাচ্ছিলাম না। আমার চাচাত ভাই ও জামাই মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির ছেলে মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা ছিল আমার মত। পিতাকে (মাওলানা ইলিয়াস) তিনি কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা করলেও তাবলীগের ওপর পয়লা দিকে তারও মন পরিষ্কার ছিল না।

দিন দিন যখন কাজের প্রসারতা বাড়লো, চারদিক থেকে জামাত আসছে। নানান বুজুর্গানদের সহায়তাও শুরু হলো আমার মন আগের মতই ছিল। যার জন্য আমি খুবই পেরেশান ছিলাম। এ কাজের খুবই উপকার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হে খোদা আমার কি হলো? এ কাজ এখনওতো আমার বুঝে আসছে না। এখন আমি কি সিদ্ধান্ত নিই?

শেষমেষ শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি গাইরে মুকাল্লেদিনদের (যারা ইমানের অনুসরণ করেনা) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দিকে মুতাওজ্জাহ হলে গায়েব থেকে তাঁকে জানান হলো, 'হে ওলিআল্লাহ, আমার পূর্ণ সাহায্যতো তাবলীগের মেহনতের সাথেই রয়েছে!

এতকিছু বলার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একথাই বুঝানো যে, তাবলীগের এই মুবারাক মেহনত আদৌ কারো মনগড়া বা কোন ব্যক্তি বা দলের স্বরচিত নয়, বরং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত স্বীয় চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বদদ্বীনি সয়লাবের স্রোত থেকে উম্মতকে বাঁচানোর জন্য এ কাজকে ফের প্রকাশ করেছেন।

ক'দিনের জন্যে নিজ নিজ ঘর বাড়ি ছেড়ে বের হবার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বুঝানোর কাজ মেওয়াতে চলতে থাকল। একাজই হয়ে দাঁড়াল মাওলানার জীবনের একমাত্র আবেগ। একমাত্র আরাধ্য। অসংখ্য সফর করলেন। এই তাবলীগের মেহনতকে বোঝানোর চেষ্টা চলতে থাকল। সর্বত্র তিনি এই মেহনতকে উদ্দীপনা জাগায় এমনভাবে বোঝাতে, সমৃদ্ধ ও পবিত্র করার ওপর গুরুত্ব দিতে বললেন। তিনি বলতেন, 'এই নবীওয়ালী মেহনতের রাস্তাই হলো ধর্মীয় এবং জাগতিক অগ্রগতি ও উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি।'

মেওয়াতের ভেতরে ও বাইরে তাবলীগের সফরের জন্যে অসংখ্য জামাত

তৈরি হলো। মেহনতকে অন্য সব কিছুর তুলনায় বেশি জনপ্রিয় করার উপর গুরুত্ব দিলেন তিনি। নানান সুবিধাজনক জায়গা গুলোতে জমায়েত এবং জনসমাগমের মাধ্যমে নতুন নতুন জামাত তৈরি করার কাজ চললো। এই জামাতগুলো কোথায় যাবে তাও ঠিক হয়ে যেত ওই জমায়েতগুলোতে। লোকেরা তাবলীগে সময় দিতে আরম্ভ করল। মেওয়াতে অভূতপূর্ব এক ধারা চালু হলো। সে ধারা ছিল ঈমানের জন্যে সপ্তাহ, মাস ব্যয় করা। সহজে এভাবে বলা যায় যে ঈমান শেখার জন্যে জান মাল সময় খরচের মেহনত হচ্ছে। তাবলীগের মেহনত যা নবীরা করে গেছেন। সাহাবারা করে গেছেন।

এখন তা আবার মেওয়াত থেকে ঐ নকশাতেই শুরু হলো।

ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আর সব রকম ত্যাগ স্বীকারে তৈরি থাকার মনোভাবকে ধরে রাখা আর তা দুনিয়া জুড়ে ছড়ানোর ওপর মাওলানার ঐকান্তিক উৎসাহ ছিল।

তিনি চাইতেন যে তাবলীগের সাথীরা এমন জায়গায় পৌঁছুক। যে তারা ব্যবসা বা কৃষি কাজের ক্ষতিকে মেনে নেবে নিজ থেকে। কঠোর খাটুনির পর তা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুজগত ও পার্থিব স্বার্থকে দ্বীনের ও পারলৌকিক সফলতার জন্যে জলাঞ্জলি দেয়া, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিজ পিঠে গাট্টি ও বোঁচকা নিয়ে লোকালয়ে গিয়ে অক্লান্ত খাটুনির পর মেওয়াতে বিস্ময়কর, অসাধারণ এক পরিবর্তন দেখা গেল। তাবলীগের এই ঈমান আমল তৈরির মেহনতের মতো সে সময় আর কোন কার্যক্রম নজরে পড়ে না। কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা অঞ্চল আঁধার থেকে আলোতে এসে পড়লো। সরকার কি পারতো তার সম্পদ, লোকবল দিয়ে ঈমানের ভিত্তি মূলে মানুষকে এমনভাবে দাঁড় করাতে? এই অল্প সময়ে এত বেশি সাফল্য অর্জন করতে?

ইসলামের পয়লা যুগে মুসলমান আপন অস্ত্র আর অন্যান্য প্রাপ্তিকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে শহীদ হবার উদগ্র আকাঙ্খায় বিভোর থাকতেন। আন্তরিকতার বুনিয়াদে এখলাসের সাথে শুধুমাত্র মহান প্রভুর দেয়া জান-মাল নিয়ে মহান আল্লাহকে পাবার উদ্দেশে ধর্মযুদ্ধে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ধর্ম প্রচারক এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য কার্য নির্বাহী লোকজন আর্থিক বিনিময়ের জন্যে নয় বরং মহান করুণাময় প্রভুর দান হিসাবে ঈমান প্রচারের কাজ নিজ দায়িত্বে করে যেতেন। মেওয়াতে তাবলীগের মেহনত অর্থাৎ ইমানের দাওয়াত দেয়ার প্রবল

প্রচেষ্টার ধরনের সাথে কেউ যদি চায় এক ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবিশ্বাস্য সেই ঝলক দেখতে পাবে। পায়ে হেঁটে, কাঁধে কম্বল ঝুলিয়ে, বাহুর নিচে সিপারা গুঁজে, শুকনো খানা বা রুটি ঢিলাঢালা জামার এক কোণে বেঁধে জিহবাকে যিকিরে ব্যস্ত রেখেঁ, চোখে রাত জাগা প্রহরীর সতর্কতার স্বাক্ষর নিয়ে, সেজদার দাগে চিহ্নিত করে চলতে থাকা। মেওয়াতের তাবলীগ জামাতকে যারা দেখেছে তাদের মনে পড়বে বীরে মাওনার সেই সব শহীদ সাথীদের জীবন দানের করুণ গাঁথা। যাঁরা কোরআনুল করিম শিক্ষা দেবার উদ্দেশে এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আদেশক্রমে শরিয়তের নির্দেশনার জ্ঞান প্রচার করার নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

মাওলানার মতে সার্বিকভাবে এগিয়ে যাবার অর্থ হল ঈমানের স্ফুলিঙ্গ অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করা। ইসলামের প্রতি ঠিক আগ্রহ তৈরি করা আর ইসলামের মূল্যমান সম্পর্কে গতিশীল সচেতনতা তৈরি করা– যা লোকদের পরকালের পুরস্কারের জন্যে এই দুনিয়ার জান, মাল ও সময়ের ক্ষতিকে সহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী জীবন অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাপিত জীবনকে অনুসরণ করার প্রতি অনুরাগ, সামর্থ এবং শরীয়তের নীতি মেনে চলার প্রতি আহবান জানানো তখন আপনা আপনিই সম্ভবপর হবে।

ধর্মের প্রতি আগ্রহী হতে দেখা গেল মেওয়াতের লোকদের। যা অনেক বছরের মেহনতেও আগে সম্ভব হয়নি। এক মাইলে একটাও মসজিদ যেখানে দেখা যেত না সেখানে হাজার মসজিদ তৈরি হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো অসংখ্য মক্তব আর আরবী মাদরাসা। হাফেজের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেল। আলেমের সংখ্যাও বাড়লো। হিন্দুয়ানী পোষাকের ওপর লোকদের জন্মালো বিতৃষ্ণা ও অরুচি। শরিয়তের নমুনা মতো পোষাক পরতে আগ্রহী হয়ে উঠল। লোকদের হাতে চুড়ি এবং কানে দুল পরা বন্ধ হল। দাড়ি মুক্তভাবে ও বাধাহীন গতিতে বাড়তে থাকল। বহুঈশ্বরবাদী অনুষ্ঠানগুলো যা বিয়ের অংশ ছিল ধীরে ধীরে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হল। সুদ নিজস্ব প্রভাব হারাতে লাগল। মদ পান করা ভুলে গেল। অপরাধের হার কমে গেল। ধর্মীয় ঔদাসিন্য, এ সম্পর্কিত মনগড়া উদ্ভাবন আর অপবিত্র ইতর স্বভাব ও রীতিনীতি ঈমান ও ধর্মীয় প্রভাবে ঝরে পড়তে লাগল।

ক্বারী দাউদ নামে একজন প্রবীন মেওয়াতিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 'আপনার মেওয়াতের মাটিতে কি ঘটছে?'

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি যা জানি তা হলো, যে অবস্থা সৃষ্টির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি তা এখন আপনা আপনি ঘটছে। যা বন্ধ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা হতো, এমন কি যুদ্ধও করতে হয়েছিল অনেকবার, তা বন্ধ করা যায়নি। বদলে যাচ্ছে সেই অনাকাঙ্খিত পরিবেশ। দূর হচ্ছে অন্ধকার। ফুটছে আলো।'

মাওলানার মতে এই সবই হচ্ছে ঈমানের রাস্তায় মেহনত করার সরাসরি ফলাফল। বিশেষ করে নিয়মিত সফরের ফলে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। একটি চিঠিতে জনৈক মেওয়াতিকে তিনি লিখলেন–

'ইউপিতে পাঠানো জামাতের সফরের ফলাফল একরমই ছিল, যদিও অল্প মানুষই সেই জামাতগুলো তৈরি করতো। ঘরে কাটানো সময়ের চেয়ে সেখানে কাটানো সময় যদিও খুবই কম। মানুষ এই উঁচু মেহনতের বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার অঞ্চলের অশুভ মনমানসিকতা যা লোকদের মধ্যে প্রাধান্য পেত আর যারা অজ্ঞতার আঁধার সাগরে ডুবে ছিল, তার. ঈমান প্রসারের উঁচু এক মন মানসিকতা পাবে। শুরু হবে দিন বদলের পালা।'

তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, মেওয়াতিরা যদি তাবলীগে সময় লাগানোকে জীবনের অংশ না করে এবং ঈমানের উন্নতির জন্যে ঐকান্তিক উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তারা পা পিছলে শুধু আগের অবস্থায়ই চলে যাবে না বরং আরো খারাপ অবস্থা হবে তাদের। ধর্মীয় জাগরণের কারণে বিশ্বের চোখ মেওয়াতের দিকে ঘুরে গেল।

কিন্তু মেওয়াতের দিকে যত চোখ পড়ল ততো অক্ষমতাও দেখা গেল। খুব সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ একাকীত্বের দেয়াল এখন ভেঙে পড়েছে।

এক চিঠিতে তিনি লিখলেন, 'তাবলীগে চার মাস লাগাতে থাকো। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সফর করতে থাকো। এ ব্যাপারে তোমাদের লোকদের তৈরি করার ওপর যদি তোমরা প্রাণপণ মেহনত না করো তোমাদের সমাজ ও সম্প্রদায় ধর্ম ঈমানের প্রকৃত স্বাদ বুঝতে পারবে না। এ পর্যন্ত যা অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছে তা সত্যিই ক্ষণস্থায়ী। যদি তোমরা মেহনত ছেড়ে দাও তবে সমাজের অবস্থা আগের চেয়ে আরো বেশি খারাপ হবে। এ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাকে নিরাপত্তার উপায় হিসেবে নেয়া হয়েছে। এখন যদি মেলামেশার এই

মেহনতকে রক্ষা না করো, তবে তোমরা অন্য দলগুলোর অশুভ ইচ্ছার শিকারে পরিণত হবে।'

ভুল

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি দিল্লী ও নানান জায়গায় টাকা দিয়ে কয়েক জন ধর্ম প্রচারককে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুই আড়াই বছর পর তাদের কাজের অবস্থা দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি অনুভব করলেন যা চাইছেন তা এপথে পাওয়া সম্ভব হবে না। মেওয়াতের নিঃস্বার্থ কর্মীদের দিয়ে তাবলীগের মেহনতের যে যৌক্তিকতা সৃষ্টি হয়েছে আর তাদের বৈপ্লবিক কর্মশক্তির যা কিছু ফলাফল দেখা যাচ্ছে তা এই দুনিয়াদার ধর্ম প্রচারকদের প্রাণহীন কাজ দিয়ে আনা সম্ভব না। কাজেই মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি, বেতন ভুক্ত টাকার বিনিময়ে কর্মী রাখার ইচ্ছেকে পুরোপুরি বাদ দিলেন।

যাত্রা হলো শুরু

মেওয়াত।

ভারতের উত্তর প্রদেশের একটা এলাকার নাম।

অনেক দিন থেকেই এ এলাকার লোকেরা ছিল শিক্ষা আর ধর্ম ছাড়া। বেপরোয়া লাগামহীন জীবন। জীবন যাত্রার মানও নেহায়েত নিচু ধরনের। অনেকদিন ধরে চলছিল গেঁয়ো আর মূর্খ জীবন যাপন। মনের দিক দিয়েও এরা সেজন্যে ছোট হয়ে পড়েছিল। নিজের পাড়া ছেড়ে বাইরে কোথাও তেমন বেরুতো না তারা। হঠাৎই এদের মাঝে দিল্লী আসার ঝোঁক পড়লো। এই আলাদা একটা উদ্দীপনা দেখা দেয়ার কারণ ছিল সবার প্রিয় আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি এসব সমাজের আবর্জনার মতো মানুষগুলোকে ভালবেসে ছিলেন। তাদের দুনিয়া ও পরকালের ব্যর্থতা তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তিনি প্রায়ই সময় করে মেওয়াতে হাজির হতেন। মেওয়াতের দুখী, নিঃসঙ্গ মানুষ মাওলানা ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহির ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিল। দু' এক হপ্তা দেখা না হলে তারাই ছুটে চলে আসতো দিল্লীর নিযামুদ্দিন। তারা অনেকে নিযামুদ্দিনে এসে

দ্বীনি শিক্ষার জন্যে থেকে যেত। মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেও মেওয়াত সফরে যেতেন। গৌড়াগানুহ জেলার ফিরোজপুর ছিল মাওলানার বিশেষ লক্ষ্যস্থল। তাঁর পা এখানেই বেশি পড়তো। তিনি এখানে এসে ধর্মহীন মূর্খ মুসলমানদের দেখে বেদনায় অধীর হয়ে পড়তেন। ওখানকার বিভিন্ন মসজিদে আট দশদিন করে থাকতেন। এলাকার লোকজনের সাথে দেখা আর মেলামেশা করে তাদের দ্বীন বোঝাতেন। নামাজ রোজা না করলেও এই আঁধার জগতের মানুষেরা জুম্মার দিন মসজিদে ঠিকই হাজির হতেন। মাওলানা ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহি এই সুযোগটিই নিতেন। তিনি জুমার নামাজের পর দ্বীনের কথা বলতেন। তাঁর বক্তব্য বা বয়ান খুবই হৃদয়ছোঁয়া ছিল। কবর, হাশর, পুলসিরাতের কথা শুনে অভিভূত হয়ে যেত মেওয়াতের সহজ সরল মানুষ। সাহাবা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুঁদের জীবন কাহিনী শোনাতেন। ওই সব মহামানবদের ত্যাগ, তিতিক্ষার আর ঐশী প্রেমের চরম নিদর্শনের কথা শুনে হু হু করে তারা কাঁদতো। আরো শুনতে চাইতো। তারা মাওলানা ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহির সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়লো। সবাই তাঁর ভক্ত। সবাই তাঁকে পছন্দ করেন। কিছু লোক তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও ছাত্র হিসেবে নিযামুদ্দিনে চলে আসতেন। এখানে থাকতেন। ধর্ম শিখতেন। এভাবেই দ্বীনি জাগরণের যাত্রা হলো শুরু।

অবশ্য এর আগেই ফিরোজপুরে খানিকটা দ্বীনি জাগরণ শুরু হয়। হাফিজ ক্বারী ইসমাঈল ফিরোজপুরী সাহেবের বরকতে। তিনি কিছু ধর্মীয় কাজের ধারা এখানে শুরু করেন। ক্বারী ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহির কেরাত ছিল সুমধুর। আর সেজন্যেই তাঁর উপস্থিতির খবর শুনলে লোকজন দূর দুরান্ত থেকে ছুটে আসতো। তাঁকে দাওয়াত করেও নিয়ে যেতেন অনেকে। সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন তিনি নানান জায়গায় সফরের কারণে। দিল্লীতেও তাঁর ছিল অসংখ্য ভক্ত, সেজন্যে এখানে তাঁকে আসা যাওয়া করতে হ'তো। তাঁর ছেলেপুল সবাই ছিল শিক্ষিত। বড় ছেলের নাম মুন্সি আহমাদ খান। মেজো মুন্সী নূর বক্স আর সবার ছোটটির নাম মীর আহমাদ।

মেজো ছেলে নূর বক্স মুরিদ হন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে। বাইয়াত হবার সাথে সাথেই শায়খের প্রেমে তাঁর অন্তর ভরে ওঠে। তাই শায়খের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁর প্রেমে মন দিয়ে দুনিয়াবী সব কাজ প্রায় ছেড়ে দেন। জীবনের যাবতীয় কর্মশক্তি দিয়ে গড়ে তোলেন একটা

মাদ্রাসা। রাতদিন খাটুনি দেন ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা আর দীক্ষা (তারবিয়ত) দিয়ে গড়ে তুলতে। বাকী সময়টুকু মগ্ন হতেন ইবাদাতের গভীরতায়। শেখানোর জন্যে কোনো পারিশ্রমিক তিনি নিতেন না। একবারেই নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত খেটে পাকা করে গড়ে তুললেন মসজিদটিকে। পয়লা দিকে মাদ্রাসার কাজও চলতো সাধারণ একটা কাঁচা ঘরে। ক'দিন পরেই অসীম দয়াময়ের করুণায় নিজ খরচে পাকা করে ফেলেন এটাকে। আরো পরে মসজিদের সাথে একটা কামরা তৈরি করেন। ছাত্র পড়ানোর কাজ শেষ হলেই ওই কামরায় ঢুকতেন। দরোজা বন্ধ করে নির্জনতায় আল্লাহর ধ্যানে আর বন্দেগীতে লীন হতেন।

মুন্সিজির মাঝে ছিল অতুলনীয় তাকওয়া বা খোদাভীতি। যার জন্যে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন। তাঁর তাকওয়া ও গাম্ভীর্য অন্যদের মনে ভয় ধরিয়ে দিত।

মাঝে মাঝে কামরার বাইরে এলে তাঁকে দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো লোকজন। বড় বড় ডাকসেঁটে ধনী জমিদাররা পর্যন্ত তাঁর ভয়ে কাঁপতো। সে যুগে হুক্কার চল ছিল। মুন্সিজীকে দেখলে বড় বড় হোমরা চোমরারা পর্যন্ত হুক্কা ফেলে দাঁড়িয়ে যেত। একবার একজনের ওপর তিনি রাগ হয়েছিলেন। সে ভয়ে পেশাব করে দেয়। ছোটদের তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাদের জন্যে পকেটে চকলেট, লজেন্স রাখতেন । রোজ ওদেরকে লাড্ডু দিতেন। বলতেন, 'কাল যদি আরো বেশি ছাত্র আনতে পারো তাহলে আরো বেশি লাড্ডু পাবে।'

এমনিভাবে ক'দিন যেতে না যেতে এলাকার বেশির ভাগ ছেলে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে গেল।

এমনকি, পুরোপুরি দ্বীনহীন লোকদের ছেলেরা পর্যন্ত ক্বোরআন শরিফ, উর্দু, ফার্সি ধর্মীয় বই পড়া শিখতে শুরু করলো। তাছাড়া তারা তখনকার প্রকাশিত পত্র পত্রিকা দিয়েও উপকার পাচ্ছিল। আজকের মতো ছিল না। পত্র পত্রিকায় ঈমান, চরিত্র গঠন ও সমাজ সংস্কারমূলক পবিত্র বিষয় প্রকাশিত হত। তখনকার প্রকাশনাগুলো এ যুগের মত প্রেম প্রীতির ঘটনা আর কাল্পনিক নাটক নভেল থেকে ছিল পুরোপুরি পবিত্র। মুন্সি বক্স সাহেব এলাকায় দ্বীনের উন্নতি ও রোজকার মুসুল্লীর সংখ্যা বাড়তে দেখে গাঁয়ের অপর পাশে নতুন করে আরেকটি মসজিদ তৈরি করেন। এবার, ছোট-বড় নামে পরিচিত বস্তির দু'দিকে দুটি মসজিদ হলো। বড় মসজিদটি বস্তির উত্তর দিকে, ছোট মসজিদ বস্তির দক্ষিণে। দুটো মসজিদই মুন্সিজির প্রচেষ্টায় তৈরি। ১৯৪৪ সালে বড় মসজিদটির (যেটা

মসজিদের নূর নামে পরিচিত) পুরোন ভিত্তি ঠিক রেখে পশ্চিম অংশ কিছুটা প্রশস্ত এবং পুরোন অংশের পুব দেয়ালে নতুন ভাবে তিনটি দরজা তৈরি করা হয়। মুসুল্লিদের বিভিন্নদিক দিয়ে খুবই সুবিধা হয়। বাইরের মেহমানদের সেখানে এস্তেমার জন্যে বেশ সুযোগ হয়। দিন দিন মুসুল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। তারপর বস্তির পশ্চিম অংশে তৃতীয় আরো একটি মসজিদ তৈরি করা হলো। এই তৃতীয় মসজিদটি তৈরির ব্যাপারে মুন্সি নূর বক্স সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র নম্বরদার মেহরাব খান সাহেবের বেশ অবদান রয়েছে। মুন্সি নূর বক্স সাহেবের চেষ্টায় মেওয়াতের চারদিকে বিশেষ করে ফিরোজপুরে দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষার উন্নতি বেড়েই চললো। গাঁয়ে হাফেজ ক্বারী মুন্সি মাওলানার সংখ্যা বেড়ে গেল। ফিরোজপুরে কোরআনের হাফেজ হয়ে গেলেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে হাফেজ খোদা বক্স, হাফেজ ক্বারী আবদুর রহিম বিশেষভাবে পরিচিত।

দ্বীনি দায়িত্বশীল পুরোন মুরুব্বীরা বলেন যে, মেওয়াতে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে মুন্সিজীর অবদান অপরিসীম। এমনকি সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক দ্বীনদার হোক বা দুনিয়াদার হোক সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মুন্সি নূর বক্স সাহেবেরই ছাত্র। মেওয়াতে সর্বপ্রথম মুন্সিজীই মাদরাসা তৈরি করেন। ফিরোজপুর এলাকায়। তিনি শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে কোনও হাদিয়া নিতেন না। মাদরাসার কামরাগুলো পর্যন্ত করেন নিজ খরচায়। ছাত্রদেরকে কায়দা, আমপারা, কোরান শরিফ আর ধর্মীয় বই কিনে দিতেন নিজের টাকায়। আল্লাহপাক যেমন তাঁকে অতুলনীয় ঈমান ও আমলের দৌলতে ধন্য করেছিলেন, তেমনি অগাধ সম্মান আর অর্থ দান করেছিলেন। নানান এলাকা থেকে আসা ছাত্রদেরকে তিনি নিজ জিম্মায় রাখতেন। তাদের খরচা নিজে চালাতেন। এই মুন্সি নূর বক্স সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে কোথায় কি ভাবে পরিচয় হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে মুন্সিজী দিল্লীতেই শিক্ষার্জন করেছিলেন, যার জন্যে তাঁকে দিল্লীতে আসা যাওয়া করতে হত। তিনি নিযামুদ্দিনেও গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মাওলানা মুহাম্মদ এঁর কাছে বাইয়াত হন। যা হোক, একথা নিশ্চিত যে মুন্সিজীর জীবনে এই আমূল পরিবর্তন ও তাঁর আশ্চর্য আত্মিক উন্নতি লাভ একমাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে সম্পর্ক ও তাঁর সুদৃষ্টির বরকতেই সম্ভব হয়েছিল। শোনা যায় বাইয়াতের আগে মুন্সিজী অত্যন্ত বিলাসি জীবন যাপন করতেন। খুবই পরিপাটি হয়ে ঘোড়ায় চলে বেড়াতেন। কানে, গলায় সোনার চেন ও হাতে

রূপোর বালা পরতেন। মুন্সিজীরা ছিলেন তিন ভাই। তাঁরা সকলেই শিক্ষিত। মুন্সিজি সকলের ছোট। ছোট হিসেবে ভাইদের ও পরিবারের সবার চরম ও পরম প্রিয় নয়নমণি। সেসময় মেওয়াতিদের মধ্যে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের জন্যে এটা ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু মুন্সিজী আলালের ঘরের দুলাল হয়েও (আল্লাহর বিশেষ আশ্রয়) কখনও মদ পান করেনি। মদের ওপর তাঁর ছিল কঠোর ঘৃণা। মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এই ফিরোজপুর তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আরও অনেকবার তিনি ফিরোজপুর আসেন। অনেকবার এক দেড় সপ্তাহ সেখানে থেকে ওয়াজ নসিহত ও বাইয়াত করতেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলাইহি ও মুন্সিজীর মেহনতে মেওয়াতীদের মধ্যে দ্বীনি আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সেখানকার বস্তিতে নতুন মসজিদ তৈরি হলো। মুসুল্লির সংখ্যা বাড়ে। মৌলভী ও হাফেজ বাড়লো। অনেকে সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য নিযামুদ্দিনে পাঠালো। বিশেষ করে নামাজ, কোরান শিক্ষার প্রসারতা দিন দিন বেড়েই চললো। আল্লাহ পাকের মর্জি। এর মাঝে মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল হয়ে যায়। কিছুদিন পর শায়খ (ওস্তাদ) বিয়োগের শোকে মুন্সিজীও সকলকে এতিম করে পরপারে পাড়ি জমালেন। আল্লাহপাক উভয়কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন।

ইন্তেকালের পর আল্লাহপাক নিযামুদ্দিনে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি আর ফিরোজপুরে মুন্সিজির স্থলাভিষিক্ত করলেন তার সুযোগ্য পুত্র হাফেজ মুহাম্মাদ ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহিকে। হাফেজ ইসহাকের সাথে মুন্সিজির গুণগ্রাহী কিছু ছাত্রও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ দ্বীনি ফিকির ও জজবা রাখতেন নম্বরদার মেহবার খান, মুন্সি ওমরাও খান, মুন্সি নূর আলী খান। এরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র। আল্লাহপাকের আরো খাস মেহেরবাণী যে মুন্সিজী থাকার সময়ই এলাকাবাসি মুন্সি নাসরুল্লাহ গ্রাম সরকার হয়ে ফিরোজপুরে আসেন।

বংশগত দ্বীনি জজ্‌বায় মুন্সিজী দ্বীনি মেহনতে অংশ নিতেন। এ ছাড়া রায়সিনা অধিবাসী চৌধুরী নামাজ সাহেবও মুন্সিজীর ছাত্র ছিলেন। ফিরোজপুরে তার ভগ্নিপতির বাড়ি হওয়ায় অধিকাংশ সময় তিনিও সেখানে থাকতেন।

মিয়াজী ঈসা ফিরোজপুরী সাহেব বলেন, 'ফিরোজপুরে দ্বীনি মেহনতকারীগণকে আমি ছোট বেলা নিজ চোখে দেখেছি। তাঁরা খাওয়া দাওয়া

উঠা বসা একই সাথে করতেন। তাদের মধ্যে পরস্পর অপূর্ব ভালবাসা বিরাজ করত। কোনও অপরিচিত লোক দেখে বুঝতেই পারত না যে তাঁরা বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন গোত্রের লোক। মুন্সিজীর ছাত্রদের এক জামাত বস্তি বস্তি ঘুরে পুরুষদেরকে মসজিদে আনতে ও মহিলাদেরকে নামাজের ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপ্ত করতে থাকেন।

অন্ধকারের দিন

দিল্লীর দক্ষিণে প্রাচীন কাল থেকে বাস করে মেও জাতি। এলাকার নাম মেওয়াত। এ জায়গার সাথে জোড়া হয়েছে পাঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলা, আলোয়ার, ভরতপুরের দেশীয় রাজ্যগুলো আর উত্তর প্রদেশের মথুরা জিলা। অন্য এলাকার মতো সময়ের সাথে মেওয়াতের সীমানা আর আয়তন বাড়ছে। এখনকার মেওয়াতের চেহারা আগের চেয়ে ঢের তফাৎ।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন মেওরা আর্য নয়। এরা প্রাচীন ভারতের অনার্য। আর্য জাতির রক্তধারা বয়ে নেয়া রাজপুতদের চেয়ে এদের ইতিহাস আরো পুরনো। মেওয়াতের 'কানযাদাস' সম্প্রদায় অবশ্য রাজপুতনাদের মতোই একই বংশের। ফরাসী ইতিহাস বই ঘেঁটে দেখা যায় যেখানেই মেওয়াতী শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেখানেই 'কানযাদাস' নামটি লেখা আছে। 'আঈনি আকবরী' পড়ে আমরা জানতে পারি জাতাউ রাজপুতনারা পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে এলে তারা পরিচিতি পায় মেওয়াতী নামে।

ফিরোজ শাহী যুগ তখন শেষ হয়েছে। সে সময় প্রথম বারের মতো মেওয়াতের নাম উচ্চারণ হয়। দিল্লীর মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে মেওয়াতীরা খুবই বিপদজনক হয়ে পড়ে। লম্বা আর বড় ঘন বন যা দিল্লী পর্যন্ত চলে গিয়েছিল সেখানে তারা প্রায়ই আক্রমণ চালাতো। লুটপাট, ডাকাতি করার জন্যে। সাঁঝের পর থেকে রাজধানী ঢোকার দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো। তারপরেও তারা শহরে ঢুকে পড়তো। চালাতো ডাকাতি। গিয়াসুদ্দিন বলবন মেওয়াতীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলো শক্তিশালী সেনাদল। আফগান সেনা দিয়ে নিরাপত্তা ঘাঁটি করা হলো দিল্লীতে। সাফ করা হলো জঙ্গল। পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা হলো। তারপর থেকে মেওয়াত প্রায় একশো বছর পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল।

সুদীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকার পর মেওয়াতী দুঃসাহসী দল ফের হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিল্লীর জনমানুষের মাঝে ছড়ালো আতঙ্ক, উত্তেজনা আর ত্রাসের রাজত্ব। এই ভয়াবহ দস্যুদের দমনের জন্য দিল্লী কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন।

বাহাদুর নাসির আর তার দল এই সন্ত্রাসী কাজের জন্য দায়ী হলো। বিশিষ্ট মেওয়াতী হিসেবে পরিচিত ছিলেন লক্ষণ পাল। তিনি মেওয়াত ও তার আশ পাশ এলাকা নিজ কর্তৃত্বে এনেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়ে তিনি মুসলমান হন।

মুসলিম ধর্মবেত্তাদের প্রচারের কাজে অবহেলা আর উদাসীনতার কারণে মেওয়াতীদের ধর্ম কর্মের মান নেমে শূন্যে চলে আসে। নৈতিক চরিত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয়। তাদের জীবন যাপনের ধারা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের পুরো উল্টো। মনে হতো তারা নিজ ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, 'তারা প্রায় ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে।' আঠারো শো আটাত্তর সালে আলোয়ার গেজেটিয়ারে ছাপা মেজর পাওলেটের লেখা পড়লে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

'মেওরা সবাই এখন মুসলমান। কিন্তু তা শুধু নামে। হিন্দু জমিদারদের মতই তাদের গেঁয়ো দেবতা এক। তারা হিন্দুদের অনেক আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। হোলি পূজা হিন্দুদের একটা উৎসব। সে খুশিতে পুরোপুরি অংশ নিত আপামর মুসলমান। তারা এটাকে মুহাররাম, ঈদ আর শবে বরাতের মতই নিজেদের উৎসব মনে করতো। একই ঘটনা চলতো জন্মাষ্টমী, দিওয়ালী আর দুর্গোৎসবের সময়। বিয়ের দিন ক্ষণ ঠিক করার সময় ডাকা হতো ব্রাহ্মণদের। তাদের দিয়ে সম্পন্ন হতো এ অনুষ্ঠান। মেওয়াতীদের মাঝে হিন্দু নাম রাখার চল ছিল। অবশ্য 'রাম' নামটা তারা রাখতো না। অনেক সময় সিং তাদের নামের শেষে আসতো। তবে তা 'খান' এর মতো জনপ্রিয় ছিল না। অহি আর গুজরাটিদের মতো অমাবস্যার সময় ছুটি পালন করতো। কাজ কর্ম করতো না। কুয়া কাটার সময় প্রাচীর তৈরি করতো হনুমানের নামে আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু দেয়াল ওঠা এই জায়গা যখন ভেঙে পড়তো তখন হিন্দু মঠ, মন্দির আর গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয়ের ওপর হারিয়ে ফেলতো বিশ্বাস। সামান্য শ্রদ্ধাও আর দেখাতো না। এ নিয়ে তাদের কিছু বললে তারা বলতো, 'তোমরা হলো দেও আর আমরা মেও।'

মেওরা তাদের বিশ্বাস বা ঈমানের ব্যাপারে অবুঝ ছিল। খুব কম লোকই ওদের মাঝে কালিমা জানতো। হাতে গোনা ক'জন লোক পড়তো নামাজ। নামাজের নিয়ম আর সময় সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো জ্ঞান তাদের ছিল না।'

আলোয়ারের মেওদের এই ছিল মোটামুটি ছবি।

ব্রিটিশের অধীনে থাকা গুরগাঁও-এ ছিল মাদরাসা। সেজন্যে ওখানের অবস্থা খানিকটা উন্নত ছিল। আলোয়ারের দু' একটি জায়গায় অবশ্য অবস্থা ভালো ছিল। সে সব জায়গায় তৈরি হয়েছিল মসজিদ। দু'চারজন লোক কালিমা জানতো, নামাজ পড়তো আর মাদ্রাসার সাথে যোগাযোগ রাখতো।

বিয়ের প্রথম পর্বটা সারতো ব্রাক্ষ্মণ। বাকীটুকু দায়িত্ব নিতেন কাজী সাহেব। পুরুষরা পরতো ধুতি আর কোমর পর্যন্ত ছোট পোশাক। পাজামা মোটেও পরতো না। সোনার অলংকার পরতো তারা। গোটা ব্যাপারটাই ছিল হিন্দুয়ানী ধাঁচে।

অন্য জায়গায় মেজর পাওলেট লেখেন-

'মেওরা স্বভাবের দিক দিয়ে অর্ধেক হিন্দু ছিল। গাঁয়ের দিকে মসজিদ খুব কমই দেখা যেত। তহসিল এলাকার পঞ্চাশটি গাঁয়ের মধ্যে মাত্র আটটি মসজিদ ছিল। কিন্তু তাতেও লেগেছিল মন্দিরের ছোঁয়া।

পাঁচপীর, ভাইসা, চাহান্ড এই সব নামে পরিচিত ছিল মসজিদগুলো। চাহান্ড বা খেরাদিও মহাদেবীর পায়ের তলায় উৎসর্গ করা হতো। সেখানে পশুবলির প্রথা ছিল। শবে বরাতের সময় সব মেও পল্লীতে সাঈদ সালার বা মাসুদ গাজীর পতাকা ওড়ানো ইবাদতের মতো বিষয় ছিল।'

গুরগাঁও এর গেজেটে এ কথা লেখা আছে যে—

'মেওরা আলসে আর অমনোযোগী ধরনের মুসলমান। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো পড়শী ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে সেগুলোর মধ্যে যা ছিল বিনোদন আর আনন্দ উৎসবের মতো। তারপর বেশ কিছু ধর্মীয় শিক্ষক আসাতে মেওয়াতীরা রোজা রাখতে শুরু করে। গ্রামে মসজিদ তৈরি হলো। নামাজীর সংখ্যা বাড়লো। মেয়েরা হিন্দুদের ঘাগরা ছেড়ে পাজামা ও বোরখা পরা শুরু করলো। তাদের মাঝে ধর্মীয় জাগরণের প্রথম সূচনা ঘটলো।'

ভরতপুরের গেজেটিয়ারে লেখা আছে-

'হিন্দু ও মুসলমান মিলে একটা নতুন ধর্ম মেনে চলতো মেওরা। তারা মুসলমানী ও নিকাহ করে। কবর দেয় মৃতদের। আবার বাহরাইচ নামক জায়গায় সাঈদ সালার মাসুদ গাজীর সমাধিস্তম্ভে তীর্থযাত্রা করে। তার পতাকাতলে অঙ্গীকার করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা ভারতের অন্য রাজ্যে তীর্থ যাত্রা করে। কিন্তু হজ্বের দাম দেয় না। তারা হোলি আর দেওয়ালী পূজা করে। তাদের মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে কোনো অংশ থাকে না। হিন্দু মুসলিম মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখে। তারা পুরোপুরি মূর্খ। তাদের সাথে থাকে বয়াতী আর চারণ কবি। যাদের অনেক টাকা দেয়া হয়। কৃষি আর গাঁয়ের জীবনের ওপর লেখা চতুষ্পদী কবিতা তাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। ওগুলো তারা আবৃত্তি করে। এদের কথা খুব রুক্ষ আর কর্কশ। মেয়ে আর ছেলের ডাকার ধরন একই রকম। নেশা পানির অভ্যেস। ঈমানী দিক দিয়ে দুর্বল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দৈব ঘটনা বা পূর্বলক্ষণে বিশ্বাসী। মায়ের সম্মতি নিয়ে শিশু হত্যা করা ছিল এদের আগের অভ্যেস। এখন বন্ধ হয়েছে। এরা চুরিতে কুখ্যাতি পেয়েছে। কিছু গুণও ছিল মেও জাতির মাঝে। এরা সরল মানুষ। অবিশ্বাস্য কষ্ট করতে পারে। লক্ষের প্রতি অবিচল। ইসলাম থেকে অনেক দূরে থেকেও ধর্ম একেবারে ছেড়ে দেয় নি। বিংশ শতাব্দীর মেওরা ছিল অনেকটা স্বেচ্ছাচারী আরবদের মতো।'

আলোর পথে

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মীয় কুসংস্কার আর মূর্খতা দূর করার জন্যে আসল পথ হলো প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান প্রচার আর চর্চার মাধ্যমে তাদের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। সেজন্যে দরকার অবিরাম যোগাযোগ। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের সাথে। ধর্মের নিয়ম কানুন, নীতি, আচার অনুষ্ঠানের বাইরের ও ভেতরের প্রক্রিয়া তাদের কাছে তুলে ধরা, পরিচিত করা আর নিয়মিত চর্চা করে এগুলোতে তাদের অভ্যেস গড়ে তোলা। মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল আর তার পরে মাওলানা মুহাম্মাদ একই পথ বেছে নিয়েছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁদের চেয়ে এক পা আগে বাড়লেন। মেওয়াতে মক্তব আর মাদরাসা তৈরি করলেন। যাতে ঈমানের প্রভাব বড় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবর্তন দ্রুত হয়।

একজন প্রাজ্ঞ আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে যদি তাঁর

ভক্ত ও অনুরাগীরা কাছে ডাকে সেটা কেমন হয় এটা মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি জানতেন। ভাল খাবার, তোষামদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখা আর ভক্তদের শ্রদ্ধার ওপর তিনি ছিলেন বিরক্ত। আগে তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন কাজের কাজ কতটুকু হবে। ইসলামের ওপর চলার জন্যে লোকজন কতটুকু আগ্রহী আর উদাসী হবে সেটা খেয়াল করতেন। তিনি ধারণা করতেন মাদরাসা আর মক্তব প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বীনি উন্নতি হবে। সেজন্যে কোথাও দাওয়াত নেবার আগে বলে নিতেন, 'আগে বলো, ওখানে মক্তব মাদরাসা দেবে তো?'

কিন্তু মেওয়াতীদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ছেলে পুলেদের মক্তবে দিলে রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যেত। শর্ত শুনে অসহায় হয়ে পড়তো তারা। মাওলানা তাদের আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলীর কথা বলতেন। তাঁর ওপর ভরসা রাখতে বলতেন। মেওয়াতীরা শর্ত মেনে নিত।

মাদরাসা তৈরি হলো মেওয়াতে।

তিনি মেওয়াতীদের বলতেন, 'তোমরা আমাকে ছাত্র জোগাড় করে দিও। আমি তোমাদের অর্থ যোগান দেব।'

এক সফরে তিনি দশটা মক্তব তৈরি করলেন।

মেওয়াতীরা কাঁপা কণ্ঠে তাঁকে বলতো, 'ছেলেপুলেরা চাষবাস, গরু ছাগল দেখাশুনা ছেড়ে দিলে খাবো কি?'

তাদের বোঝাতে অনেক দেরি হতো মাওলানার। অনেক কথা খরচ করতে হতো। অবিরাম সহ্য, ধৈর্য আর অধ্যবসায় দিয়ে তাদের উদ্দীপনা চাঙ্গা করতেন। এত কিছু তিনি করতেন নিজের কাজ মনে করে। সীমাহীন খাটুনি আর অর্থ কড়ি খরচ করতেন এর জন্যে। এই জাতীয় দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় কাজগুলো ঠিক মতো আদায়ের জন্যে নিজের জানমাল অকাতরে খরচ করতে হবে।

একদিন।

এক লোক এলো। হাতে টাকার থলি। এটা খরচ করার জন্যে কবুল করতে বললেন। মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি আলাইহি বললেন, 'আমরা যদি মহান প্রভু আল্লাহতায়ালার দেয়া কাজকে নিজের কাজ না মনে করি তাহলে কি করে তাঁর বাধ্য দাস হিসেবে দাবী করবো?' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমরা

মাসুম নবী আলাইহিস সালামদেরকে ঠিক মতো বুঝতে পারিনি। তাঁদের দাম সম্পর্কেও আমরা কিছুই জানিনা।'

কিন্তু মক্তব প্রতিষ্ঠার উৎসাহে ভাটা পড়লো ছোট একটা ঘটনায়। একবার এক সফরের সময় তাঁর সামনে এনে হাজির করা হলো একজন যুবককে। সবাই তার প্রশংসা করছে। সে নাকি মাওলানার প্রতিষ্ঠিত এক মাদরাসা থেকে পড়াশোনা করে বেরিয়েছে। তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। ধ্বক করে উঠলো তাঁর বুক। খানিকক্ষণ তাঁর সময় লাগলো কলিজার ব্যথাকে কমাতে। প্রবল আলোড়ন উঠলো তার অনুভূতির জগতে। হতাশায় তিনি যেন কুঁকড়ে গেলেন।

যুবকের মুখে নেই দাড়ি!

মক্তব তৈরি ছাড়াও সফরের সময় তিনি এলাকার ঝগড়া, সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে চেষ্টা করতেন। কৌশলগত দক্ষতা আর উঁচু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তাঁকে সমস্যার জটিল দিকগুলো পরিষ্কার খুলে তোলার তাওফিক দিত। মেওয়াতীরা বলতো, 'এই রোগা বেঁটে লোকটা যে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হোক না কেন তার সমাধান করে দেন সহজ আর অবিশ্বাস্য দ্রুততায়।'

এমনকি একগুঁয়ে লোকগুলোও তাঁর সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নত করে দিত নিঃশর্তে। এক সময় ক'জন আলেম মেওয়াতীদের সংস্কার আর নির্দেশনার জন্যে দায়িত্ব নিলেন। তারা মেওয়াতীদের অনৈসলামিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানলেন। এতে হিতে বিপরীত হলো।

মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি আলাইহির চিন্তা বইছিল অন্য খাতে। তিনি ভাবতেন দ্বীনের দু'একটা ভুল সংশোধন করলেই পুরো দ্বীনের ওপর চলা যাবে না। এজন্যে পয়লা দ্বীনের মূল শিকড় ঈমানের ওপর আনতে হবে উম্মতকে।

কাজেই ঈমানী চেতনা ফিরিয়ে আনতে হলে ঈমানী কথা নিয়ে হাজির হতে হবে সাধারণ জনমানুষের কাছে। তারপর প্রচুর সময়, অনেক জানমাল খরচ করে জনতাকে শেখাতে হবে ইসলাম।

নতুন দিনের সূর্য

এসব নিয়ে গভীর চিন্তায় যখন নিমগ্ন তাঁর কাছে এলেন টাংগাওয়ালা বৃদ্ধ।

খুলে গেল চেতনার নতুন দুয়ার। এ সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। উনিশ শো পঁচিশ সাল। এপ্রিল মাস। আবার হজ্বে রওনা হলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি। সাথে ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত বুজুর্গ তাঁর শায়খ হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

মদিনায় দিন যায়।

সময় শেষ হয়ে এলো। হজ্ব থেকে ফিরে চলেছেন বন্ধু বান্ধব। কিন্তু মাওলানার ভেতর ফিরে আসার কোনো চিহ্ন নেই। কী এক আশ্চর্য অস্থিরতায় অধীর হয়ে রয়েছেন। ক'দিন পর সাথীরা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহমাতুল্লাহির কাছে জানালেন। যাতে তিনি তাঁকে ঘরে ফেরার জন্যে বলেন। তিনি সাথে সাথে জবাব দিলেন, 'সে যতদিন এখানে থাকতে চায় থাকুক। সাথে তোমরাও থাকো। কিংবা তোমরা তাকে রেখে চলেও যেতে পারো।'

সাথীরা তাঁর সাথে মদিনায় থাকলেন।

'মদিনায় থাকার সময় আমাকে বলা হলো, আমার দ্বীনের কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেব!!' বলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেন, 'এ কথা শোনার পর আমি দুঃশ্চিন্তার ভারে নুয়ে পড়ছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না যে কী করে আমার মতো অসুস্থ, দুর্বল আর সহায়হীন মানুষ এই কাজ করবে?

আমি ছটফট করছি। বার বার কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হচ্ছি সেই দরিদ্র মেওয়াতী টাংগাওয়ালার ওপর। সে যে আমার ভেতর কী করে দিয়েছে। এক অজানা ভয়ে থেকে থেকেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যাবার আগে আকাশে বাতাসে প্রকৃতিতে চাপা ফিস্‌ফিসানি। তখন আমি একজন প্রচন্ড আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "ভেবো না। বিচলিত হবার কিছুই নেই। একথা বলা হয়েছে তোমাকে দিয়ে করে নেয়া হবে। তিনি যেভাবে খুশি কাজ নেবেন'।

এই উত্তর শুনে তাঁর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

এ সময় তিনি দিনভর রাতভর রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারাকে সময় কাটাতেন।

রহস্যময় কতগুলো ঘটনা সেখানে ঘটে যায়।

সে সব আজ নয় কাল শোনাবো। ইনশাআল্লাহ।

এই পৃথিবীর কতো রহস্য! তার একটিই আমাদের স্তম্ভিত, হতবাক আর বিমূঢ় করে দেয়। রহস্য ভান্ডারের কতটুকু আর আমরা জানি?

সে কাহিনী তার চেয়েও বিস্ময়কর আর রহস্যেভরা।

অবিশ্বাস্য।

হজ্ব থেকে ফিরে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি উম্মতের ঈমানী দাওয়াত পৌছানোর জন্যে শুরু করলেন সফর। ইসলামের মূল কথা কালিমা নামাজ এর দিকে সাধারণ মানুষকে ডাকার জন্যে

অন্যকেও অনুপ্রাণিত করলেন। এই কাজটা সবার অচেনা। এর আগে কখনো এই কথা শোনেনি। কাজেই তারা পিছু হটলো।

নূহ একটা এলাকার নাম। সেখানে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার। ধারণার চেয়ে অনেক বেশি লোক সেখানে এলো। তিনি দাওয়াত আর তাবলীগের কাজের মাহাত্ম আর গুরুত্ব পরিষ্কার করে বোঝালেন। সবাইকে রাজী করালেন। কিন্তু সবাই সময় নিল। একমাস পর তৈরি হলো একটা জামাত। জামাত পাঠানো হলো দূর গাঁয়ে। রওনা করার সময় তাদেরকে একথা বোঝালেন যে তারাও এভাবে দাওয়াতের আমালের অপরিসীম গুরুত্ব ও মাহাত্মকে খুলে বলে গাঁয়ের লোকদের আল্লাহর রাস্তায় যেন বের করে দেয়। জামাত আটদিন থাকবে গ্রামগুলোতে। তারা পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো জামাত জুম্মা পড়বে গুরগাঁও। জেলা সোহনাতে। সেখানে এক সপ্তাহের কর্মসূচীর পরামর্শ করা হবে। সোহনায় সেই জুম্মায় নিজেই এলেন মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি । এক সপ্তাহের কাজ বোঝালেন। পরের জুম্মা আরেকটা গ্রাম তাউরুতে পড়া হবে ঠিক হলো। তৃতীয় সফর ছিল ফিরোজপুরের তেসিল এলাকার নাগিনাতে। প্রত্যেক জুম্মায় শরীক হলেন মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি। গভীর আন্তরিকতার সাথে গ্রামের অবুঝ সরল লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের মেহনত বোঝালেন। প্রথম ক'বছর মেওয়াতে এভাবেই কাজ চললো।

এ সময়ই প্রথম খুশুশী বা বিশেষ দাওয়াতের আমল হলো। দ্বীনের দিক দিয়ে বড় আর দুনিয়ার সম্পদ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে বড় এমন লোক, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের দাওয়াতের কাজ বোঝানো হলো।

তাদেরকে বলা হলো, 'আপনারা ব্যস্ত। বয়স হয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দ্বীন শেখার মতো অফুরন্ত সময় নেই। কাজেই আপনারা এই ব্যস্ততার ফাঁক সময়টুকু জামাতবন্দী হয়ে একটু দূরে নির্জনে কিছু দ্বীনি চর্চা করেন। আর যেটুকু শেখেন তা নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছে গিয়ে তাকে শেখান।'

সোনার মদিনায়

উনিশ শো বত্রিশ সাল।

মাহে রমজানের চাঁদ উঁকি দিল আকাশে। দিল্লী রেল স্টেশনে তারাবীর নামাজ পড়ে করাচীর ট্রেনে উঠে বসলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি। সাথে আরো ক'জন। হজ্বের কাফেলা। মাওলানা ইহতিশামুল হাসানও আছেন। মক্কা শরীফ থেকে তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিকে চিঠি লিখলেন যে, 'মাওলানা বেশি সময় কাটাচ্ছেন হেরেম শরীফে। ঘন ঘন লোকজনের সাথে বসছেন। আলোচনা করছেন দাওয়াতের আমালের গুরুত্ব সম্পর্কে। আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকায় মানুষের একমাত্র সফলতা এই আলোচনাও করছেন। এর আগে কোনো আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর শিষ্য বা ভক্তদের ঘরবাড়ি, পেশা, চাষাবাদ ছাড়তে বলেননি। যদিও সাময়িক। সেজন্যে সবাই অবাক হলো। এই অচেনা আর অজানা বিষয়টি বুঝতে অনেক সময়ের দরকার। তাছাড়া হঠাৎ বের হওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই সাড়া এলো কম।'

দেশে ফিরে এলেন মাওলানা।

তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে বের করলেন সমস্যাটি হচ্ছে পরিবেশ। এতে মানুষের ধর্মীয় আবেগ স্থির হয় না। নষ্ট করে দেয় দৃঢ়তা। দ্বীন শেখার জন্যে দরকার নির্জনতা আর একটানা চর্চা।

পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য তিনি পছন্দ করলেন সাহারানপুর এলাকাকে। এটা একটা ধর্মীয় কেন্দ্র। এখানে নিয়ে এক নাগাড়ে ক'দিন চর্চা করলে মন মানসিকতা আর আমলের পরিবর্তন আসবে। এরপর গড়ে উঠবে নিয়মিত আমলের অভ্যেস।

এ ব্যাপারে তিনি এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন-

'সব অপকর্মের আসল কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। ধর্মের জন্যে চেষ্টা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। তাদের অলসতা আর অপকর্মে পৃথিবী জুড়ে কত অন্যায় আর অশুভ ছড়িয়ে পড়ে তা আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন। এসব থেকে উদ্ধারের জন্যে দরকার নষ্ট হবার পরিবেশ থেকে সরে নিরালায় গিয়ে ধর্মীয় প্রেরণা আর কর্মের আলোচনা শুনে চেতনার পরিবর্তন আনা।'

তিনি মনে করতেন যে ধর্মানুরাগী মানুষের ধর্মীয় চিন্তা, চেতনা, কর্মের দিকে খেয়াল আর দেখাশোনা করা ছাড়া ধর্মকে মানুষের মাঝে টিকিয়ে রাখা কঠিন।

প্রথম পছন্দ

হজ্ব থেকে ফিরে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রথম সিদ্ধান্ত নেন তিনি ইংল্যান্ড যাবেন। ওখানে বিধর্মীদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবেন। তিনি উনিশ শো সাতাশ সালের শীত মওসুমে লন্ডনে পৌছান। শহরে মাত্র একটাই মসজিদ ছিল। তিনি ও তাঁর জামাত এখানে চল্লিশ দিন দাওয়াত, তালীম, এবাদত আর খিদমতের মেহনত করেন। এখানেই তিনি মূল সমস্যাটা ধরতে পারেন। তিনি গভীর দৃষ্টি ফেলে দেখলেন দুনিয়া জুড়ে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি আর অধর্ম ছড়াচ্ছে নামধারী মুসলমানেরা। এরা ইসলামের নামে পরিচিত। এদের কর্ম শয়তানী। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাই ইসলাম সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে।

গভীর চিন্তান্বিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখলেন।

দেশে ফেরার তোড়জোড় নিলেন পরদিনই।

ভোর হলো

দেশে ফিরে মেহনত শুরু করার জন্যে কান্দালাকে ঠিক করলেন। এটি তার নিজের শহর। তখনই এটা ছিল একটা ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র। রমজান মাসে সাথীদের নিয়ে কান্দালা যাবার জন্যে তৈরি হলেন। কান্দালার মেওয়াতীদের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া গেল খুবই কম। এমনকি তাঁর প্রিয় ছাত্র হাজী আবদুর

রহমানও তাবলীগের সফরে যেতে চাইলেন না। কিন্তু মাওলানা ছিলেন হার না মানা মানুষ। অবিচল নিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বল একটা দিক। নিজের পুরো ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে লোকদের বোঝালেন। সমাধান হলো সমস্যার।

প্রথম ছয় জন

সবচেয়ে প্রথম এক মেওয়াতী মজলিশে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আজকে আমার সামনেই মেহনতের জন্য জামাত বন্দি হয়ে যদি বের হতে, তবে আমিও তোমাদের কাজে শরিক হতাম।' তারপর অনেকক্ষণ দ্বীনের মেহনতের ফজিলত বর্ণনা করে শেষে তাশকীল শুরু করলেন।

হযরতজীর তাওয়াজ্জু, বয়ান ও উৎসাহে ছোট একটা জামাত তৈরি হলো। জামাতে শরীক হলেন ছ'জন সৌভাগ্যবান!

(১) হাফেজ মুহাম্মাদ ইসহাক বিন নুর বখশ (২) নম্বরদার মেহরাব খান। (৩) চৌধুরী নামাজ খান। বাকি তিনজন ছিলেন মাত্র বার বৎসরের ছোট ছেলে। তাঁদের একজন মাওলানা এনামুল হাসান, অন্যজন হযরত মাওলানা ইউসুফ। আরেক জনের নাম ছিল আবদুল গফুর। তিনি হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির খাস শাগরেদ ও দক্ষ আলেম হযরতজী মাওলানা ইউসুফ ও হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের সঙ্গী ছিলেন। পরে তিনি নুহ এলাকার মাদ্রাসায়ে মুঈনুল ইসলামের মুহতামীম বা অধ্যক্ষ হন। ১৯৪৮ সালে নুহতেই ইন্তেকাল করেন। সেখানেই সমাহিত হন।

জামাতের সাথিদের সাহস দেখে হযরতজী অত্যন্ত খুশি হলেন। জামাতের সফরসূচি ঠিক করে বললেন, 'আগামী জুমা তোমরা সোহনা এলাকায় পড়বে, এই জুমায় আমার অন্য জায়গা যাবার ওয়াদা রয়েছে। তোমাদের ওখানে যাওয়া হবেনা। আগামী জুমার পর তোমরা নিজেরাই সাহস করে তার পরের জুমা পর্যন্ত মেহনতের কর্মসূচি তৈরি করে তারপর আমাকে সংবাদ জানাও। আমি ওয়াদা করছি তোমাদের ওখানে অবশ্যই হাজির হবো।' তারপর অত্যন্ত খুশি ও অনেক দোয়া দিয়ে জামাত রওয়ানা করেছিলেন। জামাত রওয়ানা করার সময় হযরতজীর নুরানী চেহারায় খুশি ও আনন্দের উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছিল। হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার আরবদের সামনে বর্ণনা করেছিলেন 'সর্বপ্রথম ফিরোজপুর থেকেই জামাত বের হয়। প্রথম

জামাত রওয়ানার সময় আমিও ছিলাম।'

ছয়জনের এই প্রথম জামাতটি ঘাসিড়া হয়ে কাজ করতে করতে জুমার দিন সোহনায় পৌছে। জুমার পর জামাতের সাথী ভাবতে লাগলেন আসার সময় হযরতজী যেমন দোয়া দিয়ে পাঠিয়েছেন, ফেরার বেলাও তেমনি তাঁর দোয়া নিয়ে ফেরাই হবে ভালো। এই আগ্রহে তারা পরের জুমা পর্যন্ত মেহনতের কর্মসূচি ঠিক করে হযরতজীকে সংবাদ দিলেন। যাতে হযরতজী সেখানে হাজির হয়ে জামাতকে দোয়া দিয়ে বিদায় দিতে পারেন। জামাতের সাথীরা পরামর্শ করে পরবর্তী জুমা তাউরু এলাকায় পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরতজীকে সংবাদ জানানো হলো। এদিকে কালেমা নামাজের দাওয়াত দিতে দিতে জামাত সোহনা থেকে মেহনত করে জুমার দিন তাউরু পৌছুল। জুমার আগে সেখানে গাশ্ত হল হযরতজীর আসার শুভ সংবাদ শোনানো হলো। শুনে সবাই খুবই খুশি হলেন। এই তাউরু এলাকায় কশাইদের এক মহল্লা ছিল। ব্যবসার ব্যাপারে বেশি সময় তাদেরকে কোলকাতায় যাওয়া আসা করতে হত।

কোলকাতায় প্রথম

সে সময়ে কোলকাতা শহরে সুন্দর দ্বীনি পরিবেশ ছিল। সেখানকার ব্যবসায়ীদের সাথে উঠা বসা করলে সহজেই যে কোন লোক নামাজী ও দ্বীনদার হয়ে যেত। কোলকাতা শহরের দ্বীনি পরিবেশের সাথে মিশে তাউরু এলাকার কশাইগণের মধ্যেও নামাজ, দ্বীনি প্রেরণা ও বুজর্গানে দ্বীনের ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তাছাড়া জামাতের সাথীদের সাথে তাদের (কশাইদের) বন্ধুত্ব থাকায় জামাতকে তাঁরা দাওয়াত করে খাওয়ানোর জন্য খুবই অনুরোধ জানাতে লাগল। তাঁদের অবিরত অনুরোধের কারণে ও বন্ধুত্বের খাতিরে দাওয়াত কবুল করতেই হলো। অবশ্য এর আগে অনেক বস্তিতে জামাতকে খাবার জন্যে অনেক অনুরোধ করার পরেও কারো নিমন্ত্রণ কবুল করেনি। সমস্ত সফরে জামাতের সাথীরা নিজেরাই রান্না করে খেয়েছেন। সাথীরা নিষ্ঠার সাথে বলতেন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে তাদেরই খাবার খাওয়া এটা নেহায়েতই লজ্জাজনক বিষয়। কারণ এটা পরোক্ষভাবে হলেও ভিক্ষার একটা ভান হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক কশাইদের দাওয়াতে খুব বড় ধরনের আয়োজন হল। ঠিক হলো হযরতজীসহ জুমার নামাজ শেষে খাওয়া হবে।

এদিকে হযরতজী জুমার আগেই দিল্লীর কিছু ব্যবসায়ীসহ বিশাল ডেক ভর্তি জর্দা, পোলাও নিয়ে হাজির। এগুলো আনাতে কশাইরা হযরতের কষ্ট ভেবে একটু মন খারাপ করলেন। হযরতজী বুঝতে পেরে বললেন, 'ভাই, মন খারাপ করার কি আছে? তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। আমি যা এনেছি এ খাবারও তোমাদের। নাও, এগুলো তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। আমরা তোমাদের খাবার খাই, আর আমাদের খাবার তোমরা খাবে। তোমাদের পড়শিদের দেবে। এতে কোনই অসুবিধে নেই।'

হযরতজীর এই কথা শুনে তারা (কশাইরা) সীমাহীন খুশি। জুমার নামাজ শেষ হলো। নামাজ শেষে হযরতজী বয়ান করলেন। অনেক লোক বয়ানে শরিক হল। জামাতকে অনেক প্রশংসা করে হযরতজী সবাইকে এই কাজ করার ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার দাওয়াত দিলেন। সবাই মেহনত করার ওয়াদা করলো। হযরতজী তাতে আরো খুশি হলেন। সকলের কাছে আগামীতেও এই মেহনত করার ওয়াদা শুনে দোয়া দিয়ে জামাতকে বাড়ি রওয়ানা করে দিলেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক যুগে মানব জাতির হেদায়েত (সঠিক পথ) প্রদর্শনের সুব্যবস্থা রেখেছেন। ইসলাম, হেকমত, জ্ঞান ও কৌশল অনুযায়ী নানান জাতি ও গোত্রের মধ্যে এর ধারাবাহিকতা চালু করেছেন। আর এই হেদায়েতের জন্য চেষ্টা, মেহনতকারীদের আল্লাহপাক নিজেই নির্বাচন করে তাঁদেরকে নবী ও রাসুল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহপাক প্রত্যেক জাতি ও যুগোপযোগী মেহনতকারীকে ওহি বা ইলহামের (অলৌকিক আজ্ঞা) মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামীন পর্যন্ত সব যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ওই নিয়মেই অর্থাৎ নির্দিষ্ট গোত্র, জাতি ও সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনের জন্য আলাদা ভাবে নবী আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়। হেদায়েতের জন্যে গোত্র বা জাতির এই বিভক্তির মধ্যে যে কি রহস্য নিহিত তা আল্লাহই ভাল জানেন। যা হোক, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর থেকে এই নিয়ম বন্ধ করে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে সমগ্র মানবজাতির জন্য আকা-ঈ-নামদার, সারওয়ারে কায়েনাত, সরদারে আম্বিয়া, ইমামুর রাসুল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত নবী রাসুল ও পথ প্রদর্শকগণের ইমাম হিসেবে নির্বাচন করে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, এখন থেকে শুধু তারই হেদায়েত কবুল হবে। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর নবুওয়াতের সার্বজনীনতা স্বীকার

করবে, তাঁকে একমাত্র সর্বশেষ নবী হিসেবে মেনে নেবে - সে হেদায়েত পাবে। নয়তো কপালে পথভ্রষ্টতার লাল আঁক পড়বে। এ হচ্ছে আল্লাহ পাকেরই সিদ্ধান্ত। এতে কারো কোনও জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার লেশমাত্র দখল নেই। সেই সাথে আল্লাহপাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশ্বাসী উম্মতকে কেয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের জন্য নবীওয়ালা কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'হে উম্মতে মুহাম্মাদী, তোমরাই তো সেই উত্তমজাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্যে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের দিকে ডাকবে আর খারাপ কাজ থেকে ফেরাবে। আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে।'

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন, 'হে নবী আপনি বলে দিন, এটাই আমার রাস্তা, আমি বুঝে শুনে আল্লাহর দিকে ডাকি, আর আমার অনুসারীরাও ডাকে।

'এই কাজ তাদের দায়িত্বেও অর্পিত।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র যুগ ও জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠানো হযেছে। জানা কথা যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর হায়াতে তাইয়্যিবা ছিল মাত্র তেষট্টি বছর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য নবী। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন থাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পর কেয়ামত পর্যন্ত তার এই কাজের দায়িত্ব বা ব্যবস্থা কে নেবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোরআনুল কারিম আর হাদিসে পাকেই রয়েছে। আর এ প্রশ্নের বাস্তব উত্তর হচ্ছে সাহাবা কেরাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে যে উম্মত গড়েছেন তাঁরাই হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামের এই পবিত্র দল।

তাঁদের জীবনই কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্য বাস্তব নমুনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অনুসারীদের উপর কি কি দায়িত্ব ও কি কি ভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে সাহাবায়ে কেরামের জীবনচিত্রেই তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। আল্লাহ পাকের অসীম দয়া ও অনন্ত করুণার উপর আমাদের জীবন উৎসর্গ হওয়া উচিত। তিনি সব যুগে নিজেই উম্মতের পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। যখন যে এলাকায় উম্মতের মধ্যে দ্বীনি ক্রটি বিচ্যুতি দেখা দেয় তখনই তিনি স্বীয় কোন বান্দাকে দিয়ে এলহাম (অলৌকিক আজ্ঞা) বা স্বপ্নের মাধ্যমে সে ক্রটি বিচ্যুতি সংশোধনের সঠিক উপায় উপকরণ ও নিয়ম পদ্ধতি জানিয়ে দেন।

অদৃশ্য থেকে তাঁকে (সে বান্দাকে) উম্মতের এসলাহি কাজে পূর্ণ সহায়তা করে থাকেন। এ বিষয়ে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত' নামক বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

দু'নম্বর জামাতটি তৈরি হলো এর পরেই।

হাফিজ মকবুল হাসানের জিম্মাদারীতে মেওয়াতীদের একটা জামাত কান্দালার পথে রওনা হলো। এর কিছুদিন পরেই তৈরি হলো তিন নম্বর জামাতটি। এটা পাঠালেন রায়পুরে। রায়পুর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। শাহ আবদুর রায়পুরী রহমতুল্লাহি আলাইহির মতো বুজুর্গ এখানেই থাকেন।

এখানে মনে রাখার মতো একটা ঘটনা ঘটে গেল। ক্বারী দাউদ রহমতুল্লাহি আলাইহির সন্তান সফরে বের হবার দিন মারা গেল। তার প্রাণহীন দেহ দাফন করলেন। কবরস্থান থেকেই শুরু হলো জামাতের যাত্রা। তিনি বাড়ি ফিরলেন না।

মেওয়াতের প্রতিটি তহসিল আর গুরগাঁও জেলার মানচিত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে ছিল। তিনি তাবলীগ জামাতের যাত্রাপথ ঠিক করলেন। তাদের রোজকার কাজের হিসাব রাখতে বললেন। গাঁয়ের গোষ্ঠি হিসেবে লোক সংখ্যার হিসেব নেয়া হলো। এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ের তফাৎ লিখে রাখা হলো। বড় বড় গাঁয়ের পাশের লোকালয়ের নাম আর সংখ্যার হিসেব রাখা হলো।

ফিরোজপুর জেলার চিতাউরার বৈঠকে জামাতকে সংগঠিত করা হলো। প্রতিটি জামাতে একজনকে আমির করা হলো। চারজন আমিরের ওপর একজন আমিরে ওমরাহ করা হলো। ছোট দলগুলো গোটা মেওয়াতে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তার মাঝে চারটির সফর ছিল পাহাড়ী এলাকায়। প্রধান সড়ক আর পাহাড়ের মাঝখানে চারটা গ্রাম। আর আলোয়ার থেকে আসা দুটো সড়ক দিল্লীতে আসা হালাওয়াদ যাবার পথের মাঝে ছিল আরো চারটা গ্রাম। জামাত এসব গ্রামে এলেই নিযামুদ্দিন থেকে লোক এসে পড়তেন। তাঁরা জামাতকে এই মেহনতের বিষয়ে আরো খোলাসা কথা বলতেন। আর শুনতেন জামাতের পেছনের কাজ কেমন করে করেছে। এ পর্যন্ত তাদের পাওয়া সাড়া, সফলতা ও অভিজ্ঞতার যাবতীয় তথ্য। মোট ষোলটি জামাত তৈরি হলো। টুকরো জামাতগুলোকে জড়ো করা হলো ফরিদাবাদ। এখানে এলেন মাওলানা ইলিয়াস

রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেই। ফরিদাবাদের ষোলটি জামাতকে চারটা জামাত করে ফের পাঠিয়ে দেয়া হলো। জামাত অনেক এলাকায় কাজ করে এলো দিল্লী জামে মসজিদে। এখান থেকে আরো জামাত পানিপথ, সানিপথ আশপাশের এলাকা ধরে এগুতে থাকলো।

আবার আসিব ফিরে

'আরবের লোকেরাই তাদের হারানো অমূল্য রতন ফিরে পাবার সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা রাখে।'

একথা প্রায় বলতেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

যখন এই দাওয়াতের কাজ ভারতের বুকে শক্ত ভিত রচনা করলো তখন তাঁর আরবে ফিরে যাবার ইচ্ছে সুতীব্র আর দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো।

উনিশ শো আটত্রিশ সাল।

হজ্বে এলেন তিনি।

প্রথম পা। কাজ নিয়ে। পবিত্র জাজিরাতুল আরবে।

সাথে সুবিশাল জামাত।

রয়েছেন হযরত মাওলানা এহতেশামুল হাসান, মৌলভী মুহাম্মাদ ইউসুফ, মৌলভী এনামুল হাসান, হাজি আবদুর রহমান।

জাহাজে তিনি রাতভর দিনভর দাওয়াত আর দ্বীন ফিরে আসার জন্যে হিজরতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম বোঝানোর কাজে ডুবে রইলেন। মক্কা যাবার পথে'বাহরা'র মহান ব্যক্তিদের মাঝে কথা বললেন। মিনাতে আসা হাজীদের সাথে ঘন ঘন আর দীর্ঘ সময় নিয়ে করলেন আলোচনা। বিশ্ব মুসলিম সমাবেশে বয়ান রাখলেন।

হজ্জ শেষ হলো।

ক'জন ভারতীয় তীর্থযাত্রীর সাথে পরামর্শ করলেন পবিত্র আরবে কিভাবে দাওয়াতের কাজ শুরু করা যায়। তারা নিরুৎসাহ করে বললো, 'এখানে ওসবের দরকার কি? এরা তো এমনিতেই দ্বীনের ওপর চলছে! দ্বীনি পরিবেশ পুরো কায়েম রয়েছে!'

তখন তিনি মাওলানা শফিউদ্দিনের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি খুব খুশি হলেন শুনে। আর বিপুল আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'শুরু করে দিন। আমি নিশ্চিত যে আল্লাহর সাহায্য আসবে।'

বাহরাইন থেকে আসা হাজীদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা অবাক। বললো, 'এই উম্মতের একমাত্র কাজই তো এটা! আমরা দেশে ফিরে এ কাজ করবো।'

এই ছোট হাজীদের জামাতটাই প্রথম বাহরাইনে কাজ শুরু করলো। আরবে থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ করলেন। অনেকক্ষণ। তারা শুনে ভয় পেল। তাদের কাছে এ কাজ সুকঠিন। কিন্তু মাওলানা একটানা আল্লাহর সাহায্যের কথা বললেন। তাদের মন নরম হলো। তারা বললো আমরা এই কাজ করবো। কিন্তু পয়লা বাদশাহ্ ইবনে সাউদ এঁর অনুমতি নিতে হবে।

ঠিক হলো বাদশাকে চিঠিতে এ কাজ সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

তিনি এ কাজের যাবতীয় দিক পরিষ্কার তুলে ধরলেন চিঠিতে। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, লাভ, প্রয়োজনীয়তা ও পুরস্কারের আলোচনা করলেন।

দু'সপ্তাহ কেটে গেল।

চিঠি দেয়া হয়েছে। উত্তর নেই।

একদিন। এলো সেই শুভ সংবাদ।

বাদশাহ ডেকে পাঠিয়েছেন মাওলানাকে।

উনিশ শো আটত্রিশ, চোদ্দ মার্চ।

বাদশাহের দরবারে এলেন মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে হাজী আবদুল্লাহ দেহলভী, হাজি আবদুর রহমান মাযহার আর মাওলানা এহতেশামুল হাসান।

বাদশাহ তাঁর মসনদ থেকে নিচে নেমে এলেন। সু-স্বাগতম!

তারপর তাঁর মহামূল্যবান সময় দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট ধৈর্য ধরে সব শুনলেন।

শুনলেন অমিয় বাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদ, কোরআন, সুন্নাত, শরিয়ত, দাওয়াত ও হিজরতের আলোচনা। জ্ঞানগর্ভ, প্রজ্ঞাময় আর

বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক আকর্ষণে ভরা কথাগুলো শুনে চেয়ে থাকলেন ছোট খাটো মানুষটার দিকে। কী গভীর আর ব্যঞ্জনাময় তাঁর কথা, চেহারা আর দৃষ্টি। বাদশাহ যেন চোদ্দ'শ বছর আগের এক মানুষকে দেখছেন। দ্বীনের জন্যে পাগল, আল্লাহর ইশ্‌ক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম পিয়ুষে পরিপূর্ণ এক সাধক আর মানুষের জন্যে নিবেদিত প্রাণ একজন মহান মানুষকে দেখলেন।

এক সময় তাঁর তন্ময়তা কাটলো।

তিনি আরবে এই কাজ করার জন্যে একমত হলেন।

বিদায় বেলা।

মসনদ থেকে ফের নেমে এলেন তিনি।

বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মহান মেহমান কে!

পরের দিন সুলতান রিয়াদ গেলেন।

মাওলানা ইহতিশামুল হাসান লিখলেন একটা চিঠি। তা পাঠানো হলো আরবের প্রধান বিচারপতির কাছে। কাজীউল কুজাত তাঁদের সাথে দেখা করলেন। তিনি সব শুনলেন। একমত হলেন।

তবে বললেন, 'এর অনুমতি নিতে হবে আমীরে ফয়সালের কাছ থেকে।' তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেবার প্রক্রিয়া চলার সময় মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি সকালে ও বিকালে একটা করে জামাত বের করতেন। কয়েকটা বৈঠকও হয়েছিল। সেখানে মৌলভী মুহাম্মদ ইদ্রিস আর মৌলভী নুর মুহাম্মাদ উর্দু ভাষায় কথা বলেছিলেন।

সে সময় মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সাথীদের দ্বীনের মেহনতের বিষয়টির ওপর গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন দ্বীনি অন্য সব আমলের মূল শেকড় হচ্ছে দাওয়াত। এ বিষয়ে তাঁর সুযোগ্য জগতদ্বিখ্যাত পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

'আমরা বাবুল উমরার কাছে কামরায় বসা ছিলাম। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি কথা বলছিলেন। আমরা মুগ্ধ শ্রোতা।

আচমকা একজন অপরিচিত মানুষ এলেন। তিনি দরজার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "তোমরা যে কাজ করছো তা নিয়ে এগিয়ে যাও। এর পুরস্কার অনেক বড়"।

হঠাৎ এসেছিলেন। হঠাৎই মিলিয়ে গেলেন।

ওই আগন্তুক।

মাওলানা কিন্তু তখনো আলোচনা করে যাচ্ছেন। এ কাজ সম্পর্কে।

কে এলো কে গেল তা যেন তিনি দেখতেই পাননি।'

মক্কা থেকে মদিনায় এসে মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি জানতে পারলেন যে মদিনার গভর্ণর তাবলিগের মেহনত চালু করার জন্যে অনুমতি দিতে পারেন না। কাগজপত্র মক্কায় পাঠালেন আর উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন।

মাওলানা অবিরাম আলোচনা চালালেন একাকী ও সমাবেশে। এর মাঝে দু'বার বুব্বা, দু'বার অহুদে যান। বেদুঈনদের সাথে দেখা করেন। শিশুদের সাথে কথা বলেন।

কালিমা শেখান।

তখন একথা স্পষ্ট হলো যে ভারতের চেয়ে আরবে এই মেহনত বেশি দরকার

দিন যায়।

সরকারী অনুমোদন আসেনা।

পরামর্শ হলো। বোঝা গেল এখানে দীর্ঘ দিন থাকতে হবে। কমপক্ষে দু'বছর।

তখন মাওলানা চাইলেন আগে ভারতের মেহনত আরো শক্তপোক্ত হোক। তারপর যোগ্য লোকের হাতে মেহনত তুলে দিয়ে আরবে আসা যাবে। আর সঠিক পথ বের করার জন্যে সময় নিয়ে মাথা খাটানো যাবে।

চলে এলেন রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে।

অনেক কষ্ট। কিন্তু তবু যেতেই হবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে।

মনে আশা। আমার আসিব ফিরে।

দিল্লীতে প্রথম

মাওলানা দিল্লীর গোটা তাবলীগ জামাতের আমির হাফিজ মকবুল হাসানকে করলেন। প্রতি মাসের শেষ বুধবার সব জামাত দিল্লী মসজিদে এক হবেন। সেদিন মাওলানা নিজেই চলে আসলেন। কথা বললেন। যখন এশার নামাজ শেষ তখন ঘড়িতে ঠিক বারোটা।

দিল্লীর সম্মানিত , আধুনিক ও শিক্ষিত জন সেদিন সেখানে ছিলেন। যাদের মাঝে ছিলেন।

ডঃ জাকির হোসেন ও জামেয়া মিল্লিয়ার শিক্ষকরা।

বন্দর নগরীতে প্রথম

উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সালে ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে বোম্বেতে প্রথম গাশ্ত হলো। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। জুহু বীচের কাছে বায়তুস সালাম মসজিদে এই মহান কাজ শুরু হলো।

পরে প্রতিটি সাপ্তাহিক সমাবেশে বড় বড় ব্যবসায়ী, চিত্রনায়ক, শিল্পপতি ও রাজনৈতিক নেতারা এতে শরীক হয়েছে।

প্রথম ইজতিমা

উনিশ শো একচল্লিশ সাল। আটাশ, উনত্রিশ ও ত্রিশ নভেম্বর। গুরগাঁও জেলার নূহ-এ অত্যন্ত সফল আর চমৎকার এক সমাবেশ বা ইজতিমার আয়োজন করা হলো। এতো বড় জনতার ঢল মেওয়াতে আর দেখা যায়নি। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক জমা হয়েছিল। চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন অনেকে। তাদের কাঁধে ছিল নিত্য ব্যবহারের রসদ। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মদনী রহমতুল্লাহি আলাইহি জুম্মার নামাজ পড়ালেন। শুরু হলো প্রথম ইজতিমা।

'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' এর আমির সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুফতি কিফায়েতুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি এই ইজতিমায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি গত পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত নানান রাজনৈতিক আর ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিয়েছি। কিন্তু মনে এমন গভীর ভাবে দাগ কাটেনি।

এই ইজতিমা ভোলার মতো নয়।'

লাক্ষ্ণৌ এ প্রথম সফর

উনিশ শো চল্লিশ সাল থেকেই লক্ষ্ণৌ এ কাজ শুরু হয়।

আঠারোই জুলাই উনিশ শো তেতাল্লিশ সালের এক ঝলমলে দিন। মাওলানা তাঁর চল্লিশ জন সাথী নিয়ে লাক্ষ্ণৌ পৌছুলেন।

সাথে রয়েছেন মাওলানা ইহতিশামুল হাসান, মাওলানা শফী কুরাঈশী, হাজী নাসিম। রেলওয়ে জংশন থেকে দারুন নাদওয়া যাবার পথে পড়ে মতিমহল সেতু। কাছেই সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। সেখানে সবাই মিলে পড়লেন নফল

নামাজ। তারপর দাঁড়িয়ে ধরলেন মুনাজাত। অনেকক্ষণ ধরে তা চললো। চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না সাথীরা এই করুণ মুনাজাতে।

মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি সেই মসজিদে প্রথম গেলেন যেখানে জামাতের সাথে হেদায়াতের কথা বলছিলেন হাফেজ মাকবুল হাসান, মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া, মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী, মাওলানা আবদুল হক খাদানী আর মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার ক'জন শিক্ষক।

লাক্ষ্ণৌ-এর উঁচু নিচু সব মহলে তিনি নিজে গেলেন। এই কাজ বোঝালেন। জামাত তৈরি হলো।

সেটা গেল কানপুর।

জামাতের আমির ছিলেন হাজী ওয়ালী মুহাম্মাদ। তিনি তখন ভীষণ অসুস্থ। দিন গুণছিলেন মৃত্যুর। এ অবস্থায়ই মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহির অনুরোধে বের হলেন

আল্লাহর রাস্তায়।

সিন্ধুতে প্রথম জামাত

উনিশ শো চুয়াল্লিশ এপ্রিলের শুরু।

হাফিজ মকবুল হাসানকে আমীর করে প্রায় ষাট জনের একটা জামাত সিন্ধুর পথে রওনা হলো। লাহোরে জামাতটা যাত্রা বিরতি করলো। কাবুলের হযরত নূরুল মাশাইখ এখানে ছিলেন। সাথীরা তাঁর সাথে দেখা করলেন।

পেশোয়ার থেকে আসা প্রথম জামাত

উনিশ শো চুয়াল্লিশ সাল। এপ্রিলের মাঝামাঝি।

পেশোয়ার থেকে পথে পথে মেহনত করে নিযামুদ্দিন এসে পৌঁছুলেন আরশাদ সাহেব, মাওলানা এহসানউল্লাহ, মিস্ত্রি আবদুল কুদ্দুস আর দু'জন বালক।

এভাবে কাজ দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে।

রক্তলাল সূর্যের রঙ উজ্জ্বল হচ্ছে ধীরে ধীরে।

ছড়িয়ে পড়ছে হলুদ আলোর ছটা!

দিকে দিকে।

التقدير لا يرد الا بدعاء

কপালের লেখা মোছা যায় না।
দোয়া ছাড়া।

তৃতীয় ঢেউ

আমাদের আছে দোয়া!

প্রথম দিনের সূর্য

মাওলানা তারিক জামিলের একটি অসামান্য আলোচনা।

অনুবাদ করেছেন **শফিউল্লাহ কুরাঈশী**

এক

শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও বুজুর্গ ,

আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। তার ধাঁধাঁয় আমাদের মগজ আচ্ছন্ন, তার জৌলুষে আমরা মোহিত। কিন্তু মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনের বিজ্ঞানকে আমরা দেখিনা। তার তৈরি বিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। পুরো পৃথিবীর মানব নানান দিকে পরিশ্রম করছে। তাদের উদ্দেশ্য যেন ওই বিজ্ঞানময় মহান আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি থেকে মানুষ মঙ্গল ও কল্যাণ নিতে পারে। আমরা এটাকে বিজ্ঞান বলি।

নানান ক্ষেত্রে অবিরত চেষ্টা চলছে।

নশ্বর পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে মহা পরাক্রমশালী স্রষ্টার অনেক সৃষ্টি। তার থেকে গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মানুষ। নতুন একটা জিনিষ আবিষ্কার করে। তা থেকে হয় মানুষের কল্যাণ লাভ।

এক একজন এক একটি ক্ষেত্রে পরিশ্রম করছে।

কেউ চিকিৎসার উপর, কেউ প্রকৌশল বিজ্ঞানে, কেউ শরীরবিদ্যা, কেউ পদার্থ আর কেউ রসায়নের উপর।

এভাবে নানান সৃষ্টি বস্তুর উপর গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে জিনিস তৈরি হয় বা আবিষ্কার হয় তার থেকে কল্যাণ, লাভ নেয়ার ব্যবস্থার নাম বিজ্ঞান। সাইন্স!

মহান আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন গোটা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু রয়েছে। আগুন, পানি, মাটি, হাওয়া, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা, বৃক্ষ, তরু, লতা, লোহা, তামা, পিতল-এসব আমাদেরকে কি করে বেশি কল্যাণ ও মঙ্গল দিতে পারে, ছোট্ট ক্ষণস্থায়ী হায়াতকে সহজ, সুন্দর করে গড়ে দিতে পারে-সে জন্যেই চলছে বিজ্ঞানের সাধনা। কিছু মানুষের নিরলস সংগ্রাম ও যুদ্ধ।

কিন্তু প্রতিটি জিনিস বা বস্তু আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি।

তাঁর তৈরি সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা বলেন,-

'কুল আফাত্তাখাজ্ তুম্ মিন্ দুনিহি আউলিয়া লা ইয়াম্ লিকুনা লিআনফুসিহিম্ নাফ্আও ওয়ালা দারবা।'

' আমার তৈরি বস্তু নিজ থেকে কোনও লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যতটুকু লাভ বা ক্ষতি তোমরা দেখতে পাচ্ছো তা আমারই দেয়া। আমি যখন ইচ্ছে এর থেকে লাভ উঠিয়ে নিই ফের যখন ইচ্ছে ক্ষতি করে দিই।'

কাজেই বোঝা যাচ্ছে সৃষ্টি খুব দুর্বল। আল্লাহতায়ালা সেভাবেই আমাদের পরিচয় দিয়েছেন। মাখলুক সম্পর্কে।

সৃষ্টবস্তু এতো দুর্বল যে, না তার কোন অধিকার আছে নিজ জীবনের উপর, তেমনি না কোনও হাত আছে মৃত্যুর ওপর। একবার মরে গেলে নতুন করে জীবন ফিরে পাবার কোনও ক্ষমতা তার নেই, ইচ্ছে মতো মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার ক্ষমতা বা যোগ্যতাও তার নেই।

জীবন ও মৃত্যুর বিধান আল্লাহতায়ালার হাতে। তার ইচ্ছে মতো নির্দিষ্ট মৃত্যু চলে আসে, জীবন ফিরে পায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সৃষ্ট জিনিষের কোনও ক্ষমতা নেই কারো লাভ বা ক্ষতি করার। তাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য জিনিষ হাসিল করা হতে পারে না। একটা জিনিষ পাবার জন্যে মানুষ তার সব শক্তি,

ক্ষমতা আর যোগ্যতাকে খরচ করবে, এটা মারাত্মক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব সৃষ্টির মাঝে আল্লাহতায়ালা লাভ ক্ষতি যা রেখেছেন তা মানুষের প্রয়োজনের জন্যেই। তারা জিনিষ দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাবে।

ঠিক যা দরকার সেটুকু পাবার জন্যেই পরিশ্রম করবে মানুষ। তার শারিরীক খাটুনি, মেধার খরচ হবে প্রয়োজন মতো। বেশি কোনও জিনিষই মানুষের জন্যে উপকারি নয়। উদাহরণ হিসেবে একজন ডাক্তারকে দেখুন। সে তার রোগীকে যতটুকু দরকার ঠিক ততোটুকু দেন। দরকারের বেশি নয়।

বড়ি ঠিক কতো মিলিগ্রামের হবে, রোজ ক'টা খাবে তাও লিখে দেন প্রেসক্রিপশানে। না মানলে রোগীর জন্যে মস্ত বিপদ ডেকে আনবে।

খিদে পেয়েছে একজন লোকের দুটো রুটির সমান, খেয়ে নিল পাঁচটা রুটি। নিশ্চিত অসুস্থ হয়ে পড়বে সে। ব্যথা হবে পেটে। বমি ভাব দেখা দেবে। শরীর হয়ে পড়বে দুর্বল।

কারণ?

প্রয়োজনের বেশি খেয়েছে সে।

সৃষ্টি বস্তু বা জিনিস এসবের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আর স্রষ্টা নিজেই বলে দিয়েছেন-- 'আমার সৃষ্টি খুবই দুর্বল।' এগুলো তোমাদের ততটুকু প্রয়োজন মেটাতে পারে যতটুকু আমি তাদের ক্ষমতা দিয়েছি বা বলে দিয়েছি।

কাজেই এগুলোর ওপর আমরা সব ক্ষমতা ও যোগ্যতা যদি ব্যয় করি তাতে আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার হবে, যোগ্যতার অপচয়ই হবে। আসলে বস্তুর যতটুকু গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ততটুকু জানা আর সে অনুযায়ী এগুলোর পেছনে মেধার ও শরীরের খাটুনি দেয়া। তখনই বস্তু থেকে আমরা সঠিক ভাবে উপকার পাবো।

সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ তৈরি করেছেন আমাদের সেবার জন্যে। ঠিক যতটুকু তিনি এক একটা বস্তুর জন্যে ঠিক করেছেন ততটুকুই সে আমার উপকার করবে। চাই আমি তার দিকে মনযোগ দিই বা না দিই।

সেজন্যেই সৃষ্টি বস্তুর পিছনে সম্পূর্ণ মনযোগ দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন।

সেটা কি?

সে কথায় পরে আসছি।

জিনিষ কি করে তৈরি হয়েছে? কি করে তার অস্তিত্ব এলো? এসব জ্ঞান আমাদের জানায় বিজ্ঞান।

কিন্তু বিজ্ঞান একথা জানাতে পারে না জিনিষটা কেন তৈরি হয়েছে, কেন এটার অস্তিত্ব এসেছে।

বিজ্ঞান একথা জানাতে পারবে একজন মানুষ কি করে জন্ম নিচ্ছে। বলতে পারবে না কি উদ্দেশে শিশু জন্ম নিল। কেন তাকে পাঠানো হলো দুনিয়াতে? এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান দিতে পারে না।

চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এরা কে কিভাবে রয়েছে, কেমন করে আপন আপন কক্ষপথে ঘুরছে, ঘন্টা প্রতি কতবার প্রদক্ষিণ করছে– বিজ্ঞান তা বলে দিতে পারবে। কিন্তু একথা জানাতে পারে না সূর্যকে কেন তৈরি করা হলো। চাঁদকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই বা কি? গ্রহ, নক্ষত্রগুলোর অস্তিত্ব কি কারণে?

আপনাকে জানিয়ে দেবে এই সৃষ্টি বস্তুটি এভাবে অস্তিত্ব পেয়েছে। এ জিনিষের ভেতর এসব ধরনের দোষ গুণ রয়েছে। কিন্তু কেনই বা আপনি এসেছেন এই দুনিয়াতে। আপনি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তাকে। সে চুপ।

দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তৈরি সব সৃষ্টি। আমরা যদি ইউরোপ, আমেরিকার মতো এসব সৃষ্টি বস্তুর পেছনে পরিশ্রম করি। আর এর কোন্‌টার ভেতর লাভ, কোন্‌টাতে ক্ষতি জানার জন্যে যদি সব শক্তি আর ক্ষমতা খরচ করি তাহলে জটিল এক গোলকধাঁধাঁয় আটকা পড়বো। তার থেকে মুক্তি পাওয়া হবে সুকঠিন।

আমরা যদি স্রষ্টাকে ছেড়ে দিয়ে সৃষ্টির পেছনে এজন্যে মেহনত করি যে তার লাভ হাসিল করবো। আর ক্ষতি থেকে বাঁচবো। তো জেনে নিন আমরা মানবতার উঁচু স্তর থেকে নেমে এলাম। জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি এরাও তো এভাবেই চলে। অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। নানান জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি আছে। তারাও জিনিষ থেকে লাভ নিতে পারে, ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। আর এগুলো জানতে বা শিখতে তাদেরকে কোন মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় নি। আল্লাহতায়ালা রাব্বুল

আলামিন নিজেই ওদেরকে এগুলো শিখিয়ে দেন। জানিয়ে দেন। জন্মগত ভাবে।

এটা বিংশ শতাব্দী।

এযুগের চিকিৎসকরা খুবই দুর্বল ক্ষমতাসম্পন্ন। সে জানে যে অমুক জিনিষটা খেলে আমার অসুবিধা হবে। তবুও সে খেয়ে নেয়। আমার ছোট ভাই একজন হার্ট স্পেশালিষ্ট। তাকে আমি শুধালাম, 'বলতো দেখি, হার্টের রোগ কেন হয়?'

'নানান কারণে,' সে বললো। 'তার ভেতর একটা হলো সিগারেট খাওয়া।'

'আশ্চর্য!' আমি বললাম, 'তুই তো নিজেই সিগারেট খাস। জেনে শুনে বিষ পান করছিস কেন? তাছাড়া তুই একজন ডাক্তার, সমাজ সেবক!'

অথচ অন্যদিকে দেখেন।

বনের সিংহ। তার খিদে পেয়েছে। ঠিক আছে, খাবার জন্যে তাকে ঘাস দিন। বলুন, সে খাবে? পোলাউ দিন। এটি আরও উত্তম খাবার। আর তার খিদে পেয়েছে। আধ মন পোলাউ? বলুন, সে আধ ছটাক পোলাউ খাবে?

বিরানী, কিংবা তেল বা ঘি দিয়ে ভাজা পরোটা? না সে খাবে না।

এজন্যে খাবে না যে এগুলো তার খাবার নয়। বরং তার ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু যদি আমরা ওসব না রেখে তরতাজা গোশ্‌ত রাখি, সাথে সাথেই হামলে পড়বে। কারণ ওরা জানে এটা তাদের খাবারের তালিকার মধ্যে রয়েছে।

আর ওদিকে দেখেন আমাদের চিকিৎসকদের।

তারা সে জিনিষটি নিজের জন্যে ক্ষতির তা জেনেও তা থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারে না। এতটুকু তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। জঙ্গলের জীব-জানোয়ার অবোধ। তারা কোনও বিদ্যালয়, কলেজ, বা ভার্সিটিতে পড়েনি কিন্তু ক্ষতি ও বিপদজনক বিষয়ে কী করে টের পেল?

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন। যিনি আঠারো হাজার সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি এই বিজ্ঞান বা ইল্‌ম দান করেছেন তাদের। জিভ দিয়ে পা চাটছে কুকুর।

কেন?

কারণ ব্যথা পেয়েছে সে জায়গাটায়। এ দৃশ্য আমাদের চোখে প্রায়ই পড়ে। কুকুর জানে তার জিভের লালার মাঝে অ্যান্টিসেপটিকের ব্যবস্থা রয়েছে। ওই

জ্ঞান কোত্থেকে পেল এই নীচ শ্রেণীর পশু? কোথায় শিখেছে লেখাপড়া? চট্টগ্রাম না ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে? সে প্রকৃতির প্রভু রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌তায়ালার পাঠশালায় পড়েছে। তিনি আসমান থেকে জ্ঞান দান করেছেন তাকে।

একবার ভারতের এক এলাকায় বানরের উৎপাত খুব বেড়ে গেল। ভয়াবহ ভাবে। মানুষের সাধারণ চলা-ফেরার জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। তারা কেড়ে নেয় মানুষের খাবার। তৈরি করা দুধ বা ফিরনি নিয়ে পালালো বা কাপড় ছিঁড়ে ফেললো।

কি করা যায়?

ওখানের মানুষেরা ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেল। মানুষের বুদ্ধির শেষ নেই। তারা একসাথে পরামর্শ করলো। এই জীবন্ত বিভীষিকা থেকে বাঁচার জন্যে নির্মম একটা সিদ্ধান্ত নিল। তারা রুটি তৈরি করলো প্রচুর। বিষ মাখিয়ে দিল তাতে। তারপর সেগুলো বাড়ির ছাদে ছড়িয়ে দিল। বেশ কটি বাসায়। 'খাও এগুলো!' ভাবলো, 'উচিত শিক্ষা হোক তোমাদের! মরো!'

সময় বয়ে চলেছে। অপেক্ষার শেষ হলো। একটা বানর এলো। খুব ধীরগতিতে। তার পশু ইন্দ্রিয় তাকে বিপদ সঙ্কেত ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। কারণ মানুষের মাঝে এর আগে এতো দয়া, মায়া আর মমতা তো দেখেনি তারা। তাদেরকে যে এই আশরাফুল মাখলুকাত মোটেই দেখতে পারছে না তা সে জানে। উৎপাত করায় এরা তাদের উপর খুব রেগে আছে আর খুব বিরক্ত তাও জানে। তাহলে?

এতো সুন্দর করে বানানো রুটি!?

ছড়ানো, ছিটানো!?

ঘরের ছাদে ছাদে!?

ব্যাপার কি?!

বানরটি খুব সতর্ক হয়ে গেল।

অপেক্ষায় থাকা মানুষগুলোকে চেয়ে দেখলো।

এদের চেহারায় কূট ষড়যন্ত্রের ছায়া। নিশ্চয়ই তাদের শায়েস্তা করার জন্যে কোনও ফন্দি এঁটেছে। তারা তো কখনও আমাদের মেহমানদারী করতে পারে না।

আচ্ছা? সন্দেহের ছায়া পড়লো তার চোখে।

ঠিক আছে। বুদ্ধি আমাদেরও কম নয়। আসছি।

খানিকক্ষণ রুটি শুঁকে বড় কয়েকটি লাফ আর দোলা দিয়ে এ ডাল ও ডাল ধরে ফিরে চললো সে বনে।

খানিকক্ষণ পর আবার ফিরে এলো। একা নয়। সাথে আরও চারজন বানর। বয়স্ক। বড় বড়। ওরা ছিল বানরদের পন্ডিত, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। ধরে নিন অধ্যাপক মহাশয়। ওরা রুটিগুলোর চারপাশে ঘুরলো কিছুক্ষণ। তারপর পাশে বসলো। শুঁকলো। নাক ঠেকিয়ে চোখ বুজলো। চিন্তার ঝড় চলছে তাদের মাথায়। ফেলে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে। এবার তারা উঠে পড়লো। এবং লাফিয়ে চলে গেল বনে। গ্রামের লোকজন সব দেখছে। অধীর, অস্থির। কখন বানরগুলো রুটি খাবে। কিন্তু যখন তারা ফিরে গেল হতাশা ভর করলো গ্রামবাসীদের ওপর। তারা বুঝলো তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। যখন তারা হতাশা হয়ে বাড়ি ফিরছে এমন সময় শোরগোল শোনা গেল। তারা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো বনের পথ ধরে গাছে গাছে দলে দলে বানরেরা গ্রামে ঢুকছে। তাদের গায়ের লোমকূপ সর সর করে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপার কি?

বানরগুলোর মুখে দেখা যাচ্ছে গাছের তাজা পাতাসমেত ডাল। অবাক চোখে দেখছে গ্রামবাসী। তাদের বুকের পাটাতনে আছড়ে পড়ছে হৃদপিন্ড। উন্মাতাল। কি হবে? অনেক বানর এসেছে।

তারা রুটিগুলো খাচ্ছে। মানুষের দেয়া মেহমনদারীর অপমান যেন করতে চায় না। রুটি খাবার পর পরই ওই ভাঙা ডালগুলো থেকে পাতা চিবিয়ে খেল ওরা। তারপর খানিকক্ষণ ওখানে বসে রইলো। বেশ নিশ্চিন্ত। নির্বিকার চোখে চেয়ে রয়েছে মানুষের দিকে। যেন বলতে চাইছে, 'কি, কেমন?! 'কত ধানে কত চাল? কত গমে কত আটা? দেখলে তো! আমরা মরলাম না কিন্তু! বুদ্ধির খেলায় হেরে গেলে তোমরা। বুদ্ধি শুধু তোমাদেরই আল্লাহতায়ালা দেননি। আমাদেরও কিছু দিয়েছেন।'

গাঁয়ের মানুষের দম যেন আঁটকে গেছে।

নড়াচড়ার ক্ষমতাও যেন হারিয়েছে তারা। পায়ে যেন পেরেক মেরে দিয়েছে কেউ। চোখ ছানাবড়া। ঠিকরে বেরিয়ে যাবে যেন চোখের তারা। ফিরে গেল বানরেরা।

বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো।

মর্মর মূর্তির মতো?

কে শেখালো? ওদের এসব? কে দিল তাদের বুদ্ধি?

এ জ্ঞান আল্লাহ্ তাদের দিয়েছেন। আমরা যদি এসব ব্যাপার যেমন পশুরা করে শুধু কিসে তার ভাল, কিসে মন্দ আর লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশ করি। আর শুধু জিনিষের থেকে ফায়দা ওঠানো আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে সব যোগ্যতা, মেধা আর শরীরকে ক্ষয় করি তাহলে আমাদের আর পশুদের মাঝে পার্থক্য কি রইলো? খাওয়া পরা, বাঁচা, বিলাসিতা, লৌকিকতা আর বাড়ি, গাড়ি, জ্ঞান বিজ্ঞানে দুনিয়ার জীবনকে উন্নত করে পৃথিবীকে জান্নাত বানাতে পারি। কিন্তু একদিন তো এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

ওপারে!

তখন?

দুই

মৌমাছি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে এক প্রাণী।

আকারে খুবই ছোট। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় সে যে কোনও শিক্ষিত মানুষকে হার মানায়। তার কাজ কি?

কিভাবে সে জীবনযাপন করবে সবই দয়ালু আল্লাহতায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন। মৌমাছিকে দেখে একজন প্রকৌশলীকে মনে করতে পারি। আর সেই প্রকৌশলী সাধারণ কেউ নয়, অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী, মেধাবী। অসাধারণ একজন প্রকৌশলীর বুদ্ধির দীপ্তি তার ভেতর দেখতে পারি।

আবার মৌমাছির চলাফেরা, কাজ-কাম দেখে একজন প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, চিকিৎসককে কল্পনা করতে পারি।

মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে-

ফুলের রস থেকে।

মধুর ভেতর মহাকৌশলী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্তায়ালা মানুষের জন্যে রেখেছেন সুস্থতা। মৌমাছির জীবন-যাপন প্রণালী দেখলে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। বাসস্থান তৈরির কৌশলে, সেখানে থাকার নিয়ম শৃঙ্খলায়, বাসা তৈরির পরিকল্পনায়, নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, ফুল থেকে রস সংগ্রহ করায়- সবখানে তাদের অলৌকিক নৈপুণ্য ও বুদ্ধির ছটা দেখতে পাওয়া যায়।

তারা কোথায় শিখলো এই লেখাপড়া? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পাঠশালায়।

ফুলের খোঁজে বের হয় মৌমাছি। রস সংগ্রহ করে ফুলের বুক থেকে। ফিরে আসে বাসায়। বাসা থেকে বের হওয়া আর মধু সংগ্রহ করে ফিরে আসা এই তার কাজ। আধ কেজি মধু যোগাড় করতে একটা মৌমাছির কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হয়। দূর দূরান্তে ছুটে চলে মৌমাছিরা মধু জোগাড় করতে। অনেক দূরের পথ পাড়ি দেয় কিন্তু তারা পথ হারায় না। গতিপথও তারা ভুল করে না। এক আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন আল্লাহ্তায়ালা এদের ভেতর। ফুল খোঁজে মৌমাছি। পেয়ে যায় এক সময়। হয়তো তখন সে বাসা থেকে অনেক দূরে। ওখান থেকেই ইথারের মাধ্যমে বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে আসে তার খবর। চলে আসে বাসায়। মৌমাছিদের কাছে।

মৌমাছির মাথার ওপর রয়েছে দুটো সরু শুঁড়। ওটা কাজ করে এ্যান্টিনার মতো। এ দু'টোই খবর পাঠানোর কাজে সহায়তা করে। ফ্যাক্স, দূরালাপন, টেলেক্স, ই-মেইল আর ইন্টারনেট এসব বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়। আর তার কৃতিত্বও ফলানো হয়। আসলে এতে কৃতিত্বের কিছুই নেই। এসব তো অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাঝে। হাজার বছর আগে থেকে মৌমাছিরা এসব পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

মৌমাছি তার শুঁড় দুটো (অ্যান্টেনা স্বরূপ) নাড়াতে থাকে। তারা একটু হয়তো গাইলো, একটু নাচলো। ওদিকে খবর পৌঁছে গেল বাসায়। সেখানে আবার ব্যবস্থা রয়েছে সংবাদ সংগ্রহের। তাদের কোনও বাধার সৃষ্টি হচ্ছেনা। ঠিক ঠিক মতোই বাতাসে ভেসে আসছে খবর--- 'মধু পাওয়া গেছে, তোমরা এসো।'

এই খবর পেয়ে রাণী মৌমাছির নির্দেশে সহযোগী মশারা উড়াল দিল বন্ধুর ঠিকানা অনুযায়ী। মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে ঠিকানা মতো ঠিক পৌঁছে যায় তারা। ওখানে জোগাড় করে মধু। ফেরার পথেও যাতে তারা পথ না হারায় সেজন্যে রয়েছে অভিনব ব্যবস্থাপনা। বাসা থেকে পাঠানো হচ্ছে সংকেত। সময় মতো। 'ঠিক কতো মাইল দূরে আছো তুমি', 'এখন পুবে না পশ্চিমে' 'এবার যাচ্ছো উত্তরে না দক্ষিণে' 'বাসা তোমার এদিকে'-- এমন সব দিক নির্দেশনার মাঝ দিয়ে বাসায় পৌঁছে যায় তারা।

সামান্য একটা ঠিকানা খুঁজে পেতে আমাদের লেগে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। যদি ঠিকানা হারিয়ে ফেলি তো বার বার অন্যকে জিজ্ঞেস করতে হয়। 'ভাই, এই ঠিকানাটা কোথায় বলতে পারেন?'

আমি লণ্ডনে বার বার গিয়েছি। বারবারই হারিয়ে ফেলি রাস্তা। একবার এদিক, একবার ওদিক। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাই। শেষমেষ অবশ্য পৌঁছুতে পারি। কিন্তু মৌমাছিরা কোনও দিন তাদের যাত্রাপথ ভোলে না। হারিয়ে ফেলে না। সংগ্রহ হলো ফুলের রস। শেষ হলো ঘরে ফেরার পালা।

এবার চলবে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

যেন দুর্গন্ধ বা রুগ্ন ফুল থেকে রস সংগ্রহে না আসে। সেজন্যে কিছু মৌমাছি ঘরের চারদিকে পাহারা দেয়। এরা হচ্ছে অধ্যাপক বা বিশেষজ্ঞ। রস সংগৃহীত হবার আগে তারা পরীক্ষা করবে।

চিকিৎসক মৌমাছিরা দূষিত বা বিষাক্ত মধু সংগ্রহকারী মৌমাছি দেখই টের পেয়ে যায়। তারা খেপে ওঠে। সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দূষিত মধু সংগ্রহকারীর ওপর। ডানা ছিঁড়ে ফেলে। তাকে মেরে নিচে ফেলে দেয়।

আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন মৌচাকের নিচে পড়ে থাকে ডানা ছেঁড়া মৌমাছি। এ জ্ঞান কে শেখালো ওদের?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন!

সৃষ্ট বস্তুর পেছনে ছোটাছুটি আমাদের সাজে না। কারণ আমাদের দেখা ভুল। আমরা বাইরের চোখ দিয়ে দেখি জিনিষের ভেতর গুণাগুণ রয়েছে। ভালো -মন্দ রয়েছে। আছে উপকার আর ক্ষতি। আসলে তো তা ভুল। ডাহা মিথ্যা। ভালো ও মন্দের, গুণ আর দোষের, উপকার আর ক্ষতির সিদ্ধান্ত তো

আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে আসে।

সাইন্স বা বিজ্ঞান একটা জিনিসকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তা বলে দিতে পারে না। তাই আমরা যদি বস্তুর পেছনে পরিশ্রম করে সময়ের শুধু শুধু অপচয় করি তাহলে দুনিয়ার জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে। দু'চোখে সর্ষে ফুল দেখবো আর কাল কিয়ামতের দিন রক্ত কান্না কাঁদতে হবে।

বিজ্ঞান আমাকে এ সংবাদ দেয় না কেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তা জানতে হলে আমাকে শিখতে হবে আসমানী ইলম। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। সেই ইল্‌ম আমাকে জানাবে আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

চাঁদে যাওয়া আমাদের জন্যে আজ আর কোনও ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের অবদান! সে আজ আমাদের মঙ্গল গ্রহে যাওয়াও সহজ করে দিচ্ছে। এসব দেখে আমরা মাঝে মাঝে মনে করি আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। অনেক কিছু করে ফেলেছি। বিজ্ঞান আমাদের জানিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার কোথায় কি আছে। কতটুকু খালি জায়গা আছে। চাঁদের জায়গা কেনার জন্যে অনেক আমেরিকার ধনী বায়না করে ফেলেছে। কি করে চাঁদের দেশকে আবাদ করা যায় ভাবছে। কিন্তু ভাই, সত্যি কি আমরা কিছু করতে পেরেছি?

কিছুই করতে পারিনি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে জিন একটি জাতি। তাদের মর্যাদা মানুষের চেয়ে কম। কিন্তু তাদেরকেই এতো ক্ষমতা আল্লাহ্তায়ালা দিয়েছেন যে এক পলকে তারা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত চলে যায়। যদি কোনদিন এমন উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয় যে তার গতি প্রতি মুহূর্তে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তবুও আসমান ও জমিনের ফাঁকা জায়গাটুকু ঘুরে আসতে কোটি বছর লেগে যাবে। জিন জাতি চোখের পলকে তা ঘুরে আসতে পারে।

গ্রহ উপগ্রহে যাবার জন্যে চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু সেখানে যেতে আমাদের পরতে হয় নতুন ধরনের পোশাক। বিজ্ঞানসম্মত। নানান পরিবেশ ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মুকাবিলা করার জন্যে। সে ধরনের পোশাক না পরে গেলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। কাজেই ঐ বিজ্ঞান সম্মত পোশাক তৈরির জন্যে পোহাতে হচ্ছে নতুন ঝক্কি। লাখ লাখ ডলার খরচ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু জিন জাতি শূন্যে মহাশূন্যে পলকে কোটি কোটি মাইল অতিক্রম করছে তাতে তাদের পোশাক বদল করতে হচ্ছে না। তাহলে কি বোঝা যায়? আমরা জিনদের চেয়ে বেশি এগুতে পারিনি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন-

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

'আমি জিন ও মানবকে কেবল আমার উপাসনা আর গোলামী করার জন্যে পয়দা করেছি।'

কাজেই এই নশ্বর দুনিয়ায় একজন এঞ্জিনিয়ার প্রথমে একজন আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে বাস করবে। তেমনি একজন ডাক্তার বা রাষ্ট্রপ্রধান। সবার জন্যে একই ফায়সালা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'আফা হাসিব্ তুম আন্নামা খালাকনা কুম্ আবাসা?'

'তোমরা কি মনে করছো আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি অকারণে?'

না তোমাদের আমি, খেলা ধুলা, ভোগ-বিলাস আর আনন্দফূর্তির জন্যে তৈরি করিনি। আজ মুসলমানদের অবনতির দিন।

তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুসারী। সে বিদ্যার চরমে পৌঁছানোর জন্যে ছুটছে ইয়োরোপে, আমেরিকায়। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রকৃত অনুসারী হই। তাঁর শিক্ষাকে আসল শিক্ষা বলে মেনে নিই তাহলে আল্লাহ্ চাহেন তো দিন এমন আসবে যে ইয়োরোপের লোকেরা ছুটে আসবে আপনার দেশে। আসমানী ইল্‌ম শেখার জন্যে। তারা আপনাকে শিক্ষক বলে মানবে। আজ তারা আমাদের শিক্ষক আর আমরা তাদের ছাত্র হয়েছি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তখন আমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি বা নেয়ামত দান করবেন।

তা হচ্ছে দোয়া।

দোয়ার ভেতর এমন ক্ষমতা রয়েছে যে সব জিনিষের ক্ষমতা ও প্রতাপ তার সামনে পরাভূত হবে।

আল্লাহ্ করেন আমরা দোয়ার শক্তি পেয়ে যাই।

যখন মুসলমান দোয়ার শক্তি অর্জন করে কাজে লাগাবে তখন বস্তুবাদীরা অর্থ সম্পদ নিয়ে মেহনত করে ব্যর্থ হয়ে আমাদের পায়ের তলায় এসে পড়বে।

তারা হতবাক ও দিশেহারা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমরা কি হাসিল করেছো? তার এমন ক্ষমতা যে আমাদের বস্তুর ওপর পরিশ্রমলব্ধ জীবন পদ্ধতি বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে! যেখানে বস্তু ব্যর্থ সেখানে তোমরা সফল। ঘটনা কি?'

মুসলমান বলবেন, 'এটা হচ্ছে আল্লাহর পথে বের হয়ে অর্জিত ঈমানের বিচ্ছুরণ। ঈমান হাসিল হয়েছে আমাদের। আমরা ঈমান ও ইবাদাতের বদলে পেয়েছি দোয়ার শক্তি। তোমরা বস্তু ও সম্পদের মেহনত করে পেয়েছো পাউন্ড, ডলার, মার্ক, ষ্টারলিং, পেন্স। আমাদের কাছে দোয়ার শক্তি অর্জন করতে চাও?'

'চাই,' তারা বলবে।

'তো এসো, মুসলমান হও। এসো, আল্লাহ্ আর তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এঁর পতাকাতলে। শান্তির ছায়াতলে। "আস্‌লামতু লিরাব্বিল আলামিন"। আত্মসমর্পণ করো জগতের প্রভুর কাছে!'

তখন ওই ইহুদী, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ, হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হবে। আপনাদের ছাত্র হিসেবে আসবে। আপনাদের কাছে শিখতে। দ্বীন-ইসলাম।

সেদিন আসমানের দরজা খুলে যাবে। নেমে আসবে বরকত। রহমত। শান্তি বা সালামত। আর গোটা বস্তুবাদী বিশ্ব মূর্চ্ছা খাবে সজীব আল্লাওয়ালাদের পদতলে। দোয়া করে দেবে সব সমস্যার সমাধান।

শুধু দোয়া!

এক সাহাবী।

মাত্র বিয়ে করেছেন। হঠাৎ চোখে অসুখ দেখা দিল। এতই মারাত্মক যে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে চোখ। ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা সাহাবী চলে এলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কাছে। 'হে আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, চোখ নষ্ট হতে চলেছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন। দোয়া করে দিন।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কোনটা চাও তুমি? বেহেশ্‌ত না চোখ?'

'ইয়া রাসুলুল্লাহ!' যুবক সাহাবী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ব্যাকুল স্বরে

বললেন, 'চোখও চাই, জান্নাতও। কারণ, আমি মাত্র বিয়ে করেছি।'

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখটি হাতে নিলেন। তারপর কোটরে ঢুকিয়ে হাত ছুঁয়ে দিলেন।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সাহাবী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু কোনও বেদনা, ব্যথা নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ!

খানিকপর তিনি বললেন, 'মাশাল্লা! অপর চোখটির চেয়ে দেখছি এ চোখেই ভাল দেখা যাচ্ছে।'

এটা কীসের শক্তি!

দোয়া।

কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে হলো না। সার্জারির দরকার পড়লো না। শুধু দোয়াওয়ালার কাছে গিয়ে বলতে হলো সমস্যার কথা। আর দোয়াওয়ালার হাতের ছোঁয়ায় ভালো হয়ে গেল চোখ।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দরবারে এলেন একজন সাহাবী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু । তিনি আহত। তাঁর পা ভেঙে গেছে। দুর্ঘটনায়। অনেক দূরে ছিলেন তিনি দ্বীনি কাজে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছুতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে।

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার পায়ের হাড় ভেঙে গেছে!'

আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাঁর পবিত্র হাত ছুঁয়ে দিলেন।

সম্পূর্ণ সুস্থ।

নেই কোনও ব্যথা, বেদনা।

তিনি যদি আমাদের কাছে আসতেন তাহলে তো আমরা তাঁকে দামী হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতাম। সেখানে তাঁর পা প্লাস্টার করা হতো। তিরিশটা দিন তাঁকে ঘরে বন্দি করে রাখতেন। বের হতে দিতেন না। হয়তো তিরিশ দিন পর ঘর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বের হতেন।

চিকিৎসার নামে আজ আমরা বেশির ভাগ সময় মানুষকে মুসিবতেই ফেলে

দিই।

'এসব অলৌকিক।' সব শুনে আপনারা হয়তো বলবেন, 'এসব শুধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামকেই মানায়। তাঁর পক্ষেই সম্ভব।'

ভুল।

আপনাদের ধারণা ঠিক নয়।

শুনুন তাহলে। কিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর শক্তি ভর করেছে এক মহিলা সাহাবী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর ওপর।

এক মহিলা সাহাবী। বাচ্চার মা।

তিনি জানতে পারেন নি তাঁর বাচ্চা মারা গেছে। ওদিকে তাকে গোসল দেয়া হলো। পরানো হলো কাফনের কাপড়। বাকী রয়েছে জানাযা ও দাফন। বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কাছে। তিনি ছেলের মাকে খবর দিলেন। মা এলো। ছেলের পায়ের কাছে বসলেন তিনি। দু' রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর মোনাজাত করলেন।

বললেন, 'হে আল্লাহ্, তোমার পাঠানো ধর্ম গ্রহণ করেছি। তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পথ ধরেছি। ভুলেছি বাপ-দাদার ধর্ম। নবীর ভালবাসায় ছেড়ে এসেছি ভিটে-মাটি। মক্কা নগরী। আত্মীয় স্বজনরা যখন জানতে পারবে আমার ছেলে মারা গেছে, তারা টিটকারি, তামাশা ও তিরস্কার করবে। বলবে, "লাত, ওজ্জা আর হোবলের অভিশাপে শেষ হয়েছে ওর ছেলে।" হে আল্লাহ্, আমাকে এই লজ্জা থেকে বাঁচাও। ছেলেটিকে তো তুমি একদিন জীবিত করবেই। আজই করে দাও।'

মৃত ছেলে উঠে বসলো। কাফন সরিয়ে।

তখনও দোয়া শেষ হয়নি।

আশ্চর্য!

সাহাবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'ছেলেটির সাথে আমরা নাশতা করলাম।'

অবশেষে এই অলৌকিক ছেলেটি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। সময় ছিল ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রাদিয়া আল্লাহু তায়ালা

আনহুর খেলাফতের জমানা।

এই দোয়ার শক্তি আরও বেশি প্রভাবশালী হবে যখন আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ পুরোপুরি মানবো আর শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আদর্শ মতো জীবন যাপন করবো। তখন এই দোয়ার মধ্যে এমনই ক্ষমতা চলে আসবে যে দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ, সব কৌশল অসার আর সব প্রচেষ্টা বিফল সেখানে দোয়া তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে। একমাত্র দোয়ার প্রচেষ্টাই সফল হবে।

একজন মুসলমান ডাক্তার একদিকে চিকিৎসক অন্যদিকে দোয়াওয়ালা। বিরাট এক ক্ষমতা তার হাতে। অন্যদিকে একজন অবিশ্বাসী চিকিৎসক তো কখনো কবুল দোয়াওয়ালা হতে পারে না। তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে। যেমন আমরা ফ্রান্সে দেখেছি সেখানকার বির্ধমীরা ডাক্তারদের ওপর হতাশ হয়ে মসজিদের দরজায় লম্বা লাইন দিচ্ছে। উদ্দেশ্য? মুসুল্লীদের কাছে পানিতে ফুঁক দিয়ে নেবে।

তো তখন অবিশ্বাসী চিকিৎসকরা দোয়ার গোপন বিদ্যাকে শিখতে আপনাদের কাছে চলে আসবে। মুসলমান হবে। আপনারা হবেন তাদের শিক্ষক। ভাই, আজ তো আমরা অপমানের জীবন যাপন করছি। একদিন এমন ছিল না। আমরা ছিলাম শিক্ষক জাতি।

আর আজ?

আজ দুনিয়ার মুসলমান আয় করে, খায় অবিশ্বাসীরা। তারা মস্তিষ্ক খাটায় তার দৈহিক শক্তিকে খরচ করে, লাভ পায় ওরা। ইহুদি, নাসারা আর হিন্দুরা।

আর ঠিক এর উল্টোটা ঘটবে যদি আমরা ঈমান ও ইসলামের ওপর চলি। অন্যকে বলি। অপরকে দাওয়াত দিই। দাওয়াতের আমালের জন্যে কোরবানী দিই। তখন এমন সময় চলে আসবে, এতো বরকত আসবে যে আমরা অবাক হয়ে যাবো। আমরা তা সামলে উঠতে পারবো না। এখন এমন সময় চলছে যেন মাস যাচ্ছে সপ্তাহের মতো, সপ্তাহ দিনের, দিন ঘন্টার, ঘন্টা মিনিট আর মিনিট যেন একটা মুহূর্তের মতো। আমরা রোজগার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। হয়রান, পেরেশান। দিশেহারা! সময়কে যেন ধরে রাখতে পারছিনা।

কিন্তু যখন ঈমান ও ইসলামের মেহনতে লেগে যাবো তখন বরকতের

দরজা খুলে যাবে। অল্প সময়ে অনেক কামাই, কম রোজগারে বেশি দিন চলবে।

ভাই ও বন্ধু -

যখন মুসলমান ঈমান ও ইসলামের পরিশ্রম করেছিল। সঠিকভাবে মেনে নিয়েছিল আল্লাহ্‌র হুকুম আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতিটি আদর্শ। তখন সারা দুনিয়া মুসলমানের পায়ের তলায় এসে পড়েছিল।

রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ছিল তখনকার দিনের দুই পরাশক্তি। কি সম্পদে, কি সৌন্দর্যে, কি সভ্যতায় তারা তখন সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। তাদের সুশিক্ষিত, রণনৈপূণ্যে বিস্ময়কর শক্তিশালি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন মুসলমানগণ। মদীনার মাঠের ওপর নোংরা আবর্জনার মতো স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়েছিল তাদের হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ, রত্নরাজি।

তো?!

তিন

আবার মুসলমান যখন আল্লাহতালার হুকুম আর নবীর তরীকার পুরোপুরি অনুসরণ ও অনুকরণ করবে তখন আল্লাহ্‌র অদৃশ্য শক্তি আমাদের সাথে এসে যাবে। আমরা দোয়া করবো, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের দোয়া কবুল করবেন। যত বেশি পরিশ্রম করবে ততবেশি দোয়ার ক্ষমতা বাড়বে।

আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ মতো চিকিৎসা করবো, প্রকৌশলীর কাজ চালাবো, ব্যবসা করবো। পার্থিব সব কাজ আল্লাহ্‌র আদেশ মতো, নবীর তরীকা মতো হবে। এভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নবীর আদেশ নিয়ে যে কোনও কাজ করি, যেখানে যাই, তা সে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, চীন, জাপান বা দুনিয়ার যে কোনও প্রান্তে যাই-দ্বীন জিন্দা হবে।

আসুন আমরা আল্লাহ্‌র শক্তিকে কাজে লাগাই।

চার মাসের জন্যে বলি...।

ফুঁ দিলেন।

এবার-

বেশ ক'বার পড়লেন সুরা ফাতিহা।

ফুঁ দিলেন।

আমরা চেয়ে আছি। সম্মোহিতের মতো।

ঘড়ির দিকে।

অপলকে!

আমাদের পা যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছে কেউ মেঝেয়।

তিন পতন নিস্তব্ধতা।

রূদ্ধশ্বাস মূহুর্ত।

কী হয়, কী হয়?

কাজ হবে?

দোয়ায়?

এখনও শেষ হয়নি।

আগামী খণ্ড 'পুবের ওই আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়'।

বইটিতে পাবেন বাকী ঘটনা।

প্রথম দিনের সূর্য

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির

একটি অসামান্য আলোচনা।

অনুবাদ করেছেন শফিউল্লাহ কুরাঈশী

بسم الله الرحمن الرحيم

রাইবেন্ড।

লাহোর। চলছে জোড়। সমাবেশ।

পুরনোদের।

কথা বলছেন হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ। রহমতুল্লাহি আলাইহি। সেসব কথা ধরে রাখা হলো। তার থেকে এলো ছাপার অক্ষরে একটি বই। আকারে চটি। নাম 'তারিখে দাওয়াত ওয়া তাবলিগ'।

ওই পিচ্চি পুস্তিকাটিরই ঝরঝরে অনুবাদ।

এখানে।

চারহাজার বিঘা জমির মালিক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসামাইল। তিনি তা ছেড়ে চলে এলেন গিয়াসপুরায়। বনে! হিজরত?!

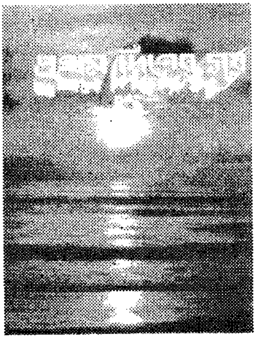
চতুর্থ ঢেউ

'আমি ইংরেজের মুখ দেখবো না! হযরতজীর পিতা গর্জে উঠলেন, 'ছেলে যদি মরেও যায়।'

তারপর তিনি সুরা ফাতিহা আর ক'টি আয়াত পড়ে ফূঁ দিলেন অসুস্থ ছেলের গায়ে।

সাথে সাথে ছেলেটি ভালো হলো।

আশ্চর্য!



এক

বন্ধু আর বুজুর্গ-

মহান আল্লাহ রাব্বল আলামিনের পবিত্র দরবারে জানাচ্ছি মনের গোপন গহন থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা। তিনি আমাদেরকে ইচ্ছে করলে ইহুদির ঘরে জন্ম দিতে পারতেন। দেন নি।

ইচ্ছে করলে তিনি পয়দা দিতে পারতেন কোনও ক্রিশ্চানের ঘরে।

দেননি।

মূর্তিপূজক হিন্দুর ঘরে জন্ম দিলেই বা কী করার ছিল? তাঁর মতো পরাক্রান্ত তো যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন।

করেন নি।

মুসলমান করেছেন।

শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবীর উম্মত করেছেন।

না চাইতে পাওয়া দান। অযাচিত। এটা যে কতো বড় তা ভাষায় বলা যায়

না। মনে মনে তাঁর শুকরিয়া করেও শেষ করা যায় না। এই উপহারের জন্যে যদি লাখো আর কোটি বছর সিজদায় পড়ে থাকি তবুও সত্যিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না।

তাই-

আমরা সবাই-

বলি-সব প্রশংসা আল্লাহর।

আল্‌হামদুলিল্লাহ!

প্রিয়জনেরা-

আজ এই শুভলগ্নে আপনারা, এই সমৃদ্ধময় কাজের পুরনোদের মাঝে আমি বসে আছি। আপনাদের প্রচন্ড আধ্যাত্মিক ছোঁয়ায় আমার চেতনায় এক নতুন প্রাণের সাড়া।

অদ্ভুত এক আবেগ।

সেই আবেগ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির তীর্থে।

বিচ্ছিন্ন সব সংলাপ। মন মাতানো মধুর স্মৃতি আমাকে স্বপ্নের দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছি সেই মোহময় অতীতে, অজানা ভুবনে।

এমন মহান কাজ, যা নবী রাসূল করেছিলেন সে কাজ ফের কী করে শুরু হলো তা শোনাতে বড়ই মন চাচ্ছে।

আপনারা রাজী তো?

একজন।

মানুষ ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মাদ ঈসমাইল।

তিনি ছিলেন অসাধারণ। সারাক্ষণ কোরআন তিলাওয়াত করতেন। অনেক জিকির করতেন। তাঁর অজিফা ছিল প্রচুর। ইয়াকীন ছিল পাহাড়ের মতো। অটল। অসামান্য ছিল তাঁর প্রজ্ঞা। মেধা ছিল বিস্ময়কর। আশ্চর্য ছিল তাঁর মনন। তাঁর মগজে মজ্জায় ছুটে চলেছিল উৎসর্গপ্রাণ রক্তধারা। আল্লাহর প্রেমে তিনি ছিলেন পাগলপারা। দ্বীনের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। মানুষের জন্যে তিনি ছিলেন প্রেমময়। মমতাময়। দ্বীন কিভাবে মানুষের মাঝে আসবে সে জন্যে তিনি ছিলেন

আকুল আর ব্যাকুল। মানুষের কল্যাণ কামনায় তিনি সব সময় জ্বলতেন, পুড়তেন। ব্যথা আর অর্ন্তজালায় থাকতেন কাতর।

ভাবতেন।

কী হবে মানুষের?

আদমের আওলাদের!

তিনি।

আল্লাহর প্রেমের সাগরে পাকা ডুবুরি ছিলেন।

তিনি।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশ্‌কে ছিলেন দিওয়ানা।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন। সত্যিই তিনি ছিলেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সুযোগ্য উত্তরাধিকার।

প্রকৃত উম্মত।

মানস সন্তান।

তিনি।

সম্পূর্ণ একটি মানুষ।

পুরোপুরি একজন জ্ঞানী। আলিম।

আর–

হাফিজ।

কোরআনুল কারিম থেকে এক একটা আয়াত খুঁজে আনতেন। তাতে আছে মহান আল্লাহ তায়ালা জাল্লাশানুহুর আদেশ। সে আদেশ, সেই হুকুম তিনি মানতেন। মানার চর্চা করতেন। আয়াতে কারিমাতে আসা আদেশ মানা শেষ হলে আরেকটি আয়াত বের করতেন। শুরু হতো নতুন উদ্যম।

উদ্যোগ।

প্রচেষ্টা।

প্রাণপণ।

আরেকটি আদেশ মানা শেষ হলো।

এবার।

আবার।

হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। নতুন আয়াতে।

ফের হুকুম মানার অনুশীলন।

চর্চা।

তাঁর হাতে আসতো হাদিসের কিতাব।

পড়তেন। জেনে নিতেন নবীজির আদর্শ। সুন্নাত। একটি।

শুরু হতো তার ওপর আমল। আর একটি সুন্নাত জানতেন। শুরু হতো দ্বিতীয় আদর্শের ওপর আমল। এমনি করে সব সুন্নাতের উপর আমল করার প্রচেষ্টা চালাতেন।

প্রাণপণ।

ফের।

একটা সুন্নাতও হাতছাড়া না হয়। একটি আদর্শও ছুটে না যায় হাত থেকে।

সেই চিন্তায় থাকতেন বিভোর। অস্থির। অধীর।

সারাক্ষণই।

একবার–

একজন প্রাজ্ঞ জ্ঞানীর কাছে তিনি গেলেন। নিজের অবস্থার কথা জানালেন। সেই জ্ঞানীর মনের চোখ খোলা ছিল। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। দিব্যজ্ঞানী। আহ্‌লে কাশ্‌ফ।

তিনি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'ভেবো না, তোমার সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। পুরোপুরি সম্পর্ক কায়েম হয়েছে সাইয়্যিদিল মুরসালিনের সাথে!'

'আমি একজন সিদ্ধ পুরুষের সান্নিধ্যে যেতে চাই।' তিনি আকুল স্বরে বললেন।

ফের হাসলেন জ্ঞানী দরবেশ।

বললেন,'দরকার নেই। কারো কাছে যাবার। মন হয়েছে ঠিক। শুদ্ধ আর পরিষ্কার। তোমার আত্মা আপনা আপনিই পবিত্র হয়েছে। সাফ হয়েছে মাথাও।

আপনা আপনিই।'

এই মহান মানুষটি কে?

মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির পিতা।

বড় হযরতজীর।

যিনি পৃথিবীর এই শেষ সময়ে যখন চারদিকে শুধু আঁধারই আঁধার। হানাহানি। রক্তারক্তি। ধ্বংস আর অবক্ষয়। অশান্তি আর অস্থিরতা। হতাশা আর হিংসা। অন্যায়, অত্যাচার আর অবিচার। চারদিকে যখন ভাঙ্গনের শব্দ শুনি। চারদিকে মিথ্যার যখন প্রলয়ধ্বনি। নাগিনীরা চারদিকে যখন ফেলিতেছে বিষ নিঃশ্বাস। চারদিকে যখন মিথ্যা, ভন্ড আর তস্করের রাজত্ব-

ঠিক তখনি-

যিনি-

তমসা রাত্রির অনন্ত অন্ধকার চিরে পুবের আকাশে আনলেন ভোরের শাদা আলো। মায়াবী নূর। শিশির ভেজা সোনার সকাল।

সেই-

বড় হযরতজীর পিতা।

উত্তর প্রদেশ।

ইউ, পি বলে সবাই চেনে। ভারতের একটি বিরাট এলাকা। এর মাঝে রয়েছে মুযাফফর নগর জিলা। তারই একটা গ্রাম ঝানঝানা। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল এই গাঁয়েরই মানুষ। জমিদার। অনেক বড় জমিদারী তাঁর। চারশোর ওপরে ঘর-বাড়ি। তাঁর নিজেরই। সব ক'টা ভাড়া দেয়া ছিল। নিজে থাকতেন ছোট একটি কুটিরে। তাঁর খাওয়া ছিল খুব কম। দিনে রাতে খেতেন একবার। কখনও দু'বার। এমন গেছে তিনি খানই নি সারাদিন। আর সেকথা মনেও নেই।

বড় হযরতজী।

হযরত মাওলানা আখতার ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর বাবার কথা অনেক সময় বলতেন। একবার বললেন, 'আমার আব্বাজান একসময় ঝান্‌ঝানা থেকে আমাকে নিয়ে আসেন নিযামুদ্দিনে। এখানে এলে মসজিদের কামরায় থাকতাম। সেবার আমার মা এসেছেন আমার সাথে। দু'জনেই দ্বীনি কথা, চিন্তা আর ভাবনায় বিভোর রইলেন সেই বিকেল পর্যন্ত। কখনও কবর, হাশর,

পুলসিরাত, মিযান, হিসাব, জান্নাত আর জাহান্নাম নিয়ে চললো তাঁদের আলাপ। ফের কী করে সবাই নামাযী, রোযাদার, দ্বীনদার, মোত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে যায় তার উপায় বের করার জন্যে আলোচনা করলেন। মগ্ন রইলেন। দিন গড়িয়ে গেল। শেষ হলো আসর নামাজ। খিদেয় আমার বত্রিশ নাড়ি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। ওদের দেখছি খেয়ালই নেই সেদিকে। চারদিকে নেমে এলো আবছা আঁধার। সূর্য যাচ্ছে পাটে। ধূসর গোধূলি। আমার চেহারায়ও নামছে কালো ছায়া। খিদে সহ্য করার। হঠাৎ আমার চেহারার দিকে নজর পড়লো আব্বাজানের। তিনি অবাক হলেন। বললেন, "ইল্য়াস! তোমাকে অমন মন মরা দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে? একেবারে চুপচাপ"?

আমি হাসতে গিয়ে কেঁদে দিলাম।

বাবা বললেন, 'ও বুঝেছি, ঝান্‌ঝানার কথা মনে পড়েছে বুঝি?'

আমার চোখ বেয়ে নেমে এলো আরো পানি।

তিনি ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখলেন। খানিকক্ষণ।

তাঁর চোখে দ্বিধা। বুঝতে পারছেন না আমার কান্নার কারণ।

মা দু'পা এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। মুছে দিলেন আমার গালের পানি। খানিকক্ষণ গালে দু'হাত রেখে চেয়ে থাকলেন। চোখে চোখে। চোখের ভেতর দিয়ে মনে ঢুকে পড়তে চাইছেন। মনে ঢুকে জানতে চাইছেন মনের কথা। খুঁজে পাচ্ছেন না কান্নার রহস্য। উত্তর না পেয়ে আমার মুখে চুমু খেয়ে বললেন, 'কি বাবা, কি হয়েছে তোমার, সোনা?'

মায়ের আদর পেয়ে আরও কান্না পেল।

'আরে! আরে, একী!' মা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। অস্থির দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকালেন। প্রশ্ন, 'কী হলো?'

'তাই তো?' ছেলে কাঁদছে কেন বুঝতে না পেরে বাবাও আমার সামনা সামনি হাঁটু গেড়ে বসলেন। কপালে হাত রাখলেন। 'না জ্বর তো নেই!' তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পেট ব্যথা হচ্ছে, বাবা?'

আমি আরও কাঁদছি।

মা বিমূঢ়। তাঁর চোখও পানিতে ভেজা। না জানি তাঁর ছেলের কি কষ্ট হচ্ছে। মা আকুল হয়ে শুধালেন, 'কী হচ্ছে তোমার, বাবা? কী কষ্ট?'

'বলো, বলো–' বাবা বললেন, 'না বললে আমরা বুঝবো কী করে?'

আমি হতবাক।

এঁরা কারা? এঁদের খিদে লাগে না?

শুধু আমারই খিদে?

বাবা অস্থির।

তিনি মাকে বললেন, 'আমি তো এর কান্নার রহস্য কিছুই বুঝতে পারছি না। মুখ ফুটে কিছু বলছেও না। তাহলে এসো এক কাজ করি। ভোর থেকে কাজের হিসেব করি। নিশ্চই কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। যার কারণে বাচ্চা কাঁদছে...'

মা ওড়নার আঁচলে চোখ মুছে নিরবে হাঁ বাচক সাড়া দিলেন।

'আমি গুণি তুমি খেয়াল করো ঠিক হচ্ছে কি না।'

মার চোখ দিয়ে আরও পানি বেরিয়ে এলো। দেখে আমি আরও আকুল হয়ে কাঁদছি।

বাবা বললেন, 'এক...দুই...'

ফজর থেকে আসর পর্যন্ত কাজের ফিরিস্তি বলা হচ্ছে। হেন করা হয়েছে, তেন করা হয়েছে। মা গুণে চলেছেন। এর মাঝে একবারও তাঁদের মনে এলো না যে খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি।

এঁরা কী?

এঁরা কারা?!

বাবা গুনছেন।

বার বার।

মা কাঁদছেন। বার বার।

আমিও কাঁদছি।

সহসা-

'মিল গ্যায়া!'

'পেয়েছি..!' বাবা চিৎকার করে উঠলেন।

'কী পেয়েছেন?' মা ব্যাকুল হয়ে বাবার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'তোমার ছেলের কান্নার কারণ!'

'কী কারণ?'

বাবা জবাব না দিয়ে দু'হাতে আমাকে ধরে ওপরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বার বার চুমু খেয়ে বললেন, 'বাবা তোমার খিদে পেয়েছে, তাই না?'

মা যেন হোঁচট খেলেন। তাঁর চেহারায় হতচকিত ভাব। বোবা হয়ে গেলেন যেন। খানিকক্ষণের জন্যে। তারপর চাপাস্বরে বললেন, 'খিদে!' একটু ভেবে, 'তাই তো! আজ সারাদিন আমরা যে কিছুই খাইনি!'

'আশ্চর্য!' বাবা বললেন, 'মনেই নেই আমাদের! আহারে আমার বাছা!'

মা ছুটে এসে বাবার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার দু'গালে চুমু খেয়ে, চোখের পানি মুছে দিয়ে বলছেন, 'আহারে! আহারে, বাছা আমার!'

তারপর?

মা ছুটলেন। খাবারের আয়োজনে।

জোরে কেঁদে উঠলাম-

আমি।'

'আমি-

আর তুমি তো বুড়ো। আমাদের হয়তো খিদে লাগে না। কিন্তু ইলিআস বাচ্চা শিশু। ওর কষ্ট হবে। তার দিকে খেয়াল রেখো। আমাদের না খেলেও চলে। কিন্তু–

'না খেলেও চলে! এ কেমন বাবা-মা! এ কেমন মানুষ।'?

কেমন মানুষ ছিলেন?

ওঁরা দু'জন?

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আর সাফিয়া বিবি!

রোজ।

হ্যাঁ, দিনভর রাতভর তাঁরা থাকতেন আল্লাহপাকের স্মরণে। জিকিরে।

সারাদিন।

সেই অনন্ত আনন্দের পরম প্রভুর স্মরণ। কালিমা দশ হাজার বার।

তাসবিহ চার হাজার বার।

দরুদ বিশ হাজার বার।

আস্তাগফার দশ হাজার বার।

আর?

রোজ-

চল্লিশ পারা কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত।

খিদে লাগার সময় কই?

খাবারই বা সময় কই?!

আর?

বাচ্চার দিকে খেয়াল রাখার সময়ই বা কখন?

এই তো ছিল তাঁদের জীবন!

আহ!

আহ!

চেঁচিয়ে উঠলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহি।

'আমার কোনও শক্ত গোনাহ্ হয়েছে।'

' কেন, কী হয়েছে?'

'ঘড়িটা নষ্ট হয়েছে।'

'ঘড়িটা নষ্ট হবার সাথে গোনাহের সম্পর্ক কি?'

'যত অসুবিধা, কষ্ট, যাতনা, বিপদ-আপদ আসে সব বদ আমলের জন্যেই। আর নেক আমল বা পূণ্যকর্ম আনে সুখ, সমৃদ্ধি, আরাম, আনন্দ আর-

শান্তি-

অনাবিল শান্তি!'

'ঘড়ি ঠিক করতে চাচ্ছেন?'

'চাইছি। নামাজ পড়ে দুআ করেছি।'

'দিল্লীতে একজন ঘড়িওয়ালা আছে। খুব ভাল ঘড়ির কারিগর।'

'আচ্ছা! বেশ তো তার কাছে নিয়ে যাও। যা মজুরী লাগে আল্লাহ পাকই ব্যবস্থা করবেন।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'বলতে ভয় পাচ্ছি, হুজুর।'

'ভয় করবে শুধু আল্লাহপাককে।'

'লোকটা ইংরেজ।'

'কে?' ভুরু কুঁচকে গেল মাওলানার।

'ওই ঘড়ির কারিগর।'

'ইংরেজ!' বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ বেরুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে।

'খুব ভালো কারিগর। যাদুর মতো মেরামত করে।'

'অসম্ভব! একজন ইংরেজ কখনো ভালো নয়। তার মুখ দেখতেও আমি রাজী নই। আমি মহান আল্লাহতায়ালার শপথ করেছি কোনও ইংরেজের মুখ দেখবো না।'

'ঘড়ি কেমন করে ঠিক হবে? কোনও মুসলমান কারিগর খোঁজ করবো?'

'না।'

'না?'

'আল্লাহ আমাকে সুরা ফাতিহা দান করেছেন।'

'সুরা ফাতিহা?'

তিনি।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল রহমতুল্লাহি আলাইহি।

আমাদের বড় হযরতজী রহমতুল্লাহি আলাইহির পিতা!

ধীরে পায়ে এগিয়ে গেলেন নষ্ট ঘড়িটির দিকে। হাতে তুলে নিলেন। চেয়ে রইলেন। অপলকে।

তাঁর ঠোঁট নড়ে যাচ্ছে। অবিরাম।

তিনি সাতবার পড়লেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

ফুঁ দিলেন।

এবার-

বেশ ক'বার পড়লেন সুরা ফাতিহা।

ফুঁ দিলেন।

আমরা চেয়ে আছি। সম্মোহিতের মতো।

ঘড়ির দিকে।

অপলকে!

আমাদের পা যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছে কেউ মেযেয়।

তিন পতন নিস্তব্ধতা।

রুদ্ধশ্বাস মূহুর্ত।

কী হয়, কী হয়?

কাজ হবে?

দোয়ায়?

এখনও শেষ হয়নি।

আগামী খণ্ড 'পুবের ওই আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়'।

বইটিতে পাবেন বাকী ঘটনা।

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছো?

কে ?

কে যাচ্ছো?

হন্তদন্ত হয়ে? দ্রুত পায়ে? ত্রস্ত? ব্যস্ত?

অস্থির।

মানুষ...

আমি তোমাকে ডাকছি। চেঁচিয়ে।

তুমি। শুনছো না।

আমি। চিৎকার করছি।

তুমি। শুনতে পাচ্ছো না?

কোথায় চলেছ? কতদূরে?

চলেছো ছুটে নীল নিসর্গরেখায়। ভুল ঠিকানায়।

ওই পথ যে আঁধারের, মানুষ! ওযে মরিচিকাময়। ধূ ধূ মরু!

তুমি যাচ্ছো?

নীল তুষারের পোশাক পরে! পৃথিবীর পথ ধরে। এই পথের শেষেই আছে বেগুনী হ্রদ। হলাহলে ভরা। আর আছে কালো পাথর। নিথর সে করেছে গ্রাস যুগ যুগ ধরে পথভোলা মানুষেরে। কালের কতো কলঙ্কিত আলেখ্য আছে লেখা ওর ভেতরে। আর আছে আশি বিষে ভরা নীল কুহকিনী। সর্পকন্যা। তার ঠোঁট চেরা।

আর আছে...

তুমি যাচ্ছো? ওখানে? নীল গাঢ় নীল সীমানায়?

তোমার মাথা নিচু। ওখানে লাল নীল জোনাকির বসেছে মেলা। চলেছে মেঘের জটিল কুটিল খেলা। বয়ে চলে সবিষণ্ন বাতাসের বিবাগী ঝড়। ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ।

তোমার বুক?

ব্যথার নীল হাওয়ায় ভরে থাকে বুকের শূন্য মাঠ। তার কালো মাটিতে জমে আছে চাপা ক্রুদ্ধ কান্না। গুমরে ওঠে। বার বার।

মন?

অনন্ত রোদনে ভরা। নিভে গেছে চেতনার চুল্লি। মননের গভীরে অবিরত কে গায় বিষাদ সঙ্গীত? লাল ইস্পাতের ঝকঝকে ছুরি করে জখম সারাক্ষণই। জ্বলে অবিরাম অচিন অনল। ধিকি ধিকি। শয়নে স্বপনে। আর জাগরণে। মেতে ওঠো তুমি আত্মহননে।

কণ্ঠ?

শুকনো নদীর মতো ভেঙে গেছে রুদ্র চৈতালী এক দুপুরে। সুরের সে প্রাণ মরে গেছে কবে বুকের আঁতুড়ঘরে! আর্তনাদের বিচূর্নিত নিরন্তর নিরুপায় স্বর মাথা কুঁড়ে মরে কালের কালো পাথরে।

শরীর?

পুঁজ, কুষ্ঠে, বহুমূত্রে শ্রান্ত। রগে রেষায় ছড়িয়ে যায় বেদনার বিষ। নুব্জ, কুঁজো তুমি মাটিতে মিশে যাচ্ছো। ক্রমেই! আগুনে, বিষে, অপমান গঞ্জনার তীব্র আশ্লেষে। তুমি শেষ।

চোখে?

নেই আলো। মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে আঁখির আকাশ। ওখানে শুধু আঁধারই। প্রেম, ব্যথার প্রহারে ভেঙেছে কর্ণিয়া। জমেছে পাথর। গ্লুকোমো। স্বর্গ স্বপ্নের নীল অসীম উপকূলে কালো পাঁচিল। মাথা তুলেছে সে। যেন ছোঁবে আকাশ। তোমাকে আঁধার করে। শিশির নিশি চোখে শুধু শোকের কালো কাজল। নীল লাল জল। খুন?

কফে, পিকে, কাদা, থুতু, কীট আর বিষে ভরা আঁধারের এই পিচ্ছিল পথ ধরে চলেছো ছুটে বিকলাঙ্গ বিকৃত পান্থ!

তবুও?!

আহ!

একটু থামো।

দাঁড়াও!

এই স্মৃতিতিথিতটরেখাতলে!

মসজিদের কবেকার পাষাণ প্রাচীর চাতালে! ছায়ায়!

এখানে বয়ে যায়। সিন্ধুস্রোত। চিরধারায়। এখানে অকূল দু'কূল জুড়ে জাগে জীবনের জ্যোতির্ময় জোয়ার।

থামো!

ওড়া শেষ!

এবার ফেরার পালা। সময়ের সাথে। সন্দেহের জমাট জগদ্দল আঁধার কেটে যাক বিশ্বাসের ঐন্দ্রজালিক অনন্ত আলোয়। পাখির হয়েছে এবার সময় ফেরার আপন কুলায়। এসো পরম প্রভুর পায়ের ধুলায়। সমর্পিত। অনেক জ্বলেছো অনলে ও জলে। এবার দাও ডুব ভালবাসার অতলান্তিক অতলে।

এখনও কি হয়নি দেখা নষ্ট নর্দমা, শ্লেষ্মা, কুকুর ও কীট? নিসর্গের এপিঠ। জানো নাকি হয়েছে চূর্ণ ভেঙে নশ্বরিত নির্মাণ, মোহের আগুন অনির্বাণ? চিত্র বিচিত্র হয়েছে মলিন?

সে যাবে কতদূরে আর?

রাত শেষে আসবে অনন্ত রঙিন দিন।

এখনও কি হয়নি সময় হবার বিশ্বাসে বিলীন।

ওই দেখো, দিগন্তে লাল অস্তাচল।

ফেরো।

হয়েছে সময় ফেরার।

এসো পাখি নীড়ে ফিরে।

মূল ঠিকানায়।

এখানে।

দাঁড়াও।

শোনো—

মনে কি পড়ে কোথা হতে এসেছো তুমি? কোথায় তোমার শেষ? কীসের নেশায় চলেছ ছুটে? কীসের আশায় উড়েছ ডানা মেলে?

তার আগে একটু দাঁড়াও!

ওই যে বিশাল বটবৃক্ষ। ঘন নিবিড় তার ছায়া। শান্তি!

ওখানে একটু বসো। এসো। হ্যাঁ। বসেছ? ঘেমে নেয়ে উঠেছ। পথশ্রমে ক্লান্ত। তোমার শ্রান্ত শরীরে মেখে নাও পরম প্রভুর অবারিত বাতাসের একটু ছোঁয়া। জিরাও। কই, মুছে ফেলো তোমার সোনালী ঘাম।

এখন শুধাই, 'পথিক, তুমি কি অমর?'

তুমি চুপ। বোবা। উত্তর দিতে পারছো না। নির্বাক।

শুধু তুমি না, ওই, দেখো, থেমে গেছে সাগরের কল্লোল ধারা, স্তব্ধ বাতাস, নেই পাতার মর্মরধ্বনি।

ভয় পেয়েছে।

ওই দেখো নীলাকাশ, মেঘ চিরে ফুঁড়ে ওঠা পাহাড়, ছোট্ট ঘাস, হাওয়ার ডানা মেলে দেয়া পাখিরা সবাই বিষণ্ন। বেদনা-বিধুর। ওরা জানে ওদের সৃষ্টিই হয়েছে ধ্বংসের জন্যে। ওই দেখো, অবোধ পশুদের। ওরা চুপ। ভাবছে। মৃত্যুর কথা। মাটিতে কান পেতে শোনো।

কী?

কীসের শব্দ?

কান্নার!

হ্যাঁ।

হাজার বছরের রুদ্ধ কান্নার চাপা গোঙানি। ওরা বলছে, 'পৃথিবীর পথিক, তোমরা তৈরি হও। মৃত্যুর জন্যে!'

গোটা প্রকৃতি জুড়ে একই চিৎকার, 'মানুষ বাঁচো। বাঁচতে যদি চাও মরার আগে মরো। শত কোটি বাঁকা চোখের ক্রুর দৃষ্টি আর শেল বেঁধা কথার আঘাত সয়ে সাজো নবীজির আদর্শে।

তরিকায়।

আর—

আল্লাহর আদেশ মানো বাধার পাহাড় পেরিয়ে।

মহাসাগরের ঢেউ, শিশির ভেজা সুনিশির, তিমির নিবিড় রাত্রি, আকাশের ঘন নীল, অরণ্যের গাঢ় কালো সবুজ, মরুর ঝিকিমিকি মরিচিকা, আর বোবা পশুরা নিরব ভাষায় প্রাণান্ত চিৎকার করে চলেছে।

আকুল আর ব্যাকুল স্বরে—

মানুষ দাঁড়াও!

একটু থামো!

দাঁড়াও পথিক!

অসামান্য আর অসাধারণ সব সম্ভার ও নিবেদন নিয়ে

আমরা আছি আপনার অপেক্ষায়...

আজই আসুন।

❑

একটি প্রকাশ কুটির

৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রথম দিনের সূর্য

আগামী পর্বের নাম-

পুবের ওই আকাশে সূর্য উঠেছে, আলোকে আলোকময়।”

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে এভাবে --

প্রশ্ন করছেন আল্লামা মনজুর নোমানী হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহিকে।

‘আচ্ছা হযরত, আমাদের দেশের এই বড় বড় রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা, নেতা, ডাক্তার আর অধ্যাপকদের কাছে এই দাওয়াত নিয়ে কিভাবে সহজে পৌছানো যায়? আমরা ওদের কাছে শীঘ্রি কিভাবে ঢুকতে পারি?’

উত্তর দিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহি-

‘ওই সব লোকদের ইমামদের নিয়ে আসবো। ইমামরা তাদের মুক্তাদির কাছে যাবে। মুক্তাদি সবসময় ইমামকে অনুসরণ করে। তারা ইমামের কথা মেনে নেবে। তাদের পেছনে দাঁড়াবে। ইমাম যা কিছু করে ওরাও তাই-ই করবে। ইমাম দ্বীনের ওপর চলতে বলবে। ওরা চলবে। বুঝেছো?’

মনযুর নোমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ‘না। বুঝিনি। পরিষ্কার বলুন।’

মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর--

‘তুমি যাদের কথা বলছো তারা আমাদের দেশের বাঘা বাঘা অফিসার, জাঁদরেল মিনিস্টার, জমিদার আর চৌধুরি-- এরা অনুসরণ করে ইয়োরোপ, আমেরিকা আর রাশিয়ার সংস্কৃতি, বিশ্বাস আর রীতিনীতি। ওরাই এদের আদর্শ আর ইমাম। ওখানে আমরা জামাত পাঠাবো। জামাতের কাজ দেখে আর প্রচন্ড পরিবর্তন সক্ষম আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে ইহুদী, নাসারা, নাস্তিক আর বিধর্মীরা ইসলাম ধর্মে আসবে। তারপর ওরা দ্বীন শেখার জন্যে চলে আসবে আমাদের দেশে। আমরা দ্বীন আর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার শিল্প আর কৌশল শিখিয়ে পাঠাবো তাদের মুক্তাদি অর্থাৎ বড় বড় দুনিয়াদার, মন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতির কাছে। তারা লজ্জা পাবে। তখন দ্বীন আর দ্বীনের দাওয়াতকে নিজের মনে করবে। আর

ওরা তাদের ইমাম (নবদীক্ষিত মুসলমান) যা করছে তাই করবে। ঠিক আছে?'

মনযুর নোমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বিমূঢ়।

তখন থেকেই শুরু হলো বিদেশে জামাত পাঠানোর প্রথম উদ্যোগ।

মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহির সময়েই সারা দুনিয়ায় জামাত যায়। তিনি যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনই হলো। দলে দলে ইহুদী, নাসারা, নাস্তিক মুসলমান হয় তাবলিগের কর্মকান্ড দেখে। দ্বীন পুরোপুরি শেখার জন্যে চলে আসে উপমহাদেশে। এরাই দাওয়াত দেয় ডঃ জাকির হোসেন, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতিকে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে।

পরে শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, মুহম্মদ এরশাদ ও অন্যান্য বড় বড় নেতাদের।

সত্যিই ওনার কথা অকাট্য দলিলে পরিণত হয়েছিল।

কৈফিয়ত

উফ্! হলো না! শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি টানা গেল না' 'প্রথম দিনের সূর্যে'র।

কয়েকটা আধমন ওজনের দীর্ঘশ্বাস ফেললাম পাণ্ডুলিপির দিকে চেয়ে। ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে উঠছে কাগজের স্তূপ। বেড়ে চলেছে পৃষ্ঠার সংখ্যা। তিন'শ ছাড়িয়ে যাবে সব কটা তথ্য এক করলে। কি করা?

তাহলে কি প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবে?

সবটা মিলিয়ে একবারে পড়ার উত্তেজনাই আলাদা। আশা তো ছিল তাই-ই।

কিন্তু সব আশার গুড়ে বালি!

দাম চড়ে হবে আকাশ ছোঁয়া, শুনে চমকে ফের একটা তিন চিল্লার নিয়ত করবেন সাথী ভাই। বইটা ধরে খানিক নাড়া চাড়া করেই রেখে দিতে হবে। দোকানে। দীর্ঘশ্বাস চেপে দেবেন আপনি হাঁটা। পেছনে ভুরু কুঁচকে অবজ্ঞা ছুঁড়ে দেবে দোকানী। না। তা হয় না।

পাঠক বলুন তো এমন জটিলতা কাটাই কী করে?

কী বললেন? 'দু'খন্ডে ছাপুন।'

'তাতে পাঠক বিরক্ত হবে না তো?'

'এছাড়া উপায় কি?'

'ঠিক। তাহলে আপনার কথাই রইলো, পাঠক।'

আগামী বার শেষ হবে বইটি। নাম পাল্টে যাবে--

পুবের ওই আকাশে সূর্য উঠেছে, আলোকে আলোকময়!

গোটা দুনিয়া জুড়ে কখন, কোথায়, কিভাবে তাবলীগের কাজ শুরু হলো তার এক চমৎকার গ্রন্থনা। সারাজীবন সংগ্রহে রাখার মতো। বংশ পরম্পরায় গল্প করার মতো রুদ্ধশ্বাস, রোমাঞ্চকর, অবিশ্বাস্য আর আশ্চর্য রহস্যময় সব ঘটনা।

এশার নামাজ পড়ে বইটা নিন। পড়ুন।

শুরু করেছেন?

কী চমকে উঠলেন?

ফজরের আজান শুনে! টেরই পাননি কখন রাত ফুরিয়ে গেছে!

অনুরোধ

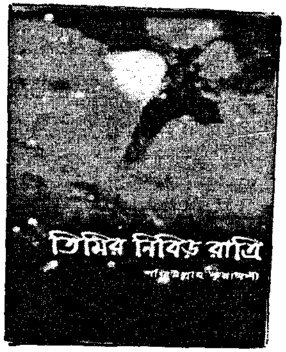
'প্রথম দিনের সূর্য' দ্বিতীয় পর্বে গোটা দুনিয়ার কোথায় কখন কিভাবে তাবলীগের কাজ শুরু হলো তা গ্রন্থিত হবে। সহৃদয় পাঠক, হিতার্থী, তাবলীগের মুরুব্বী বা কোনো সাথীর কাছে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য থাকলে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তা আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন দয়া করে।

আপনি নিশ্চয়ই চান এসব তথ্যগুলো ঠিকমত আমাদের আর পরবর্তী বংশধরের কাছে ছাপার অক্ষরে সংরক্ষিত থাকুক। কী চান না? তাহলে একটু কষ্ট করে বাসে, ট্রেনে, রিক্সায়, বেবী, গাড়িতে বা দু'পা হেঁটে এখানে চলে আসুন তথ্যগুলো নিয়ে। এছাড়া আমাদের পরবর্তী বই 'পৃথিবীর পথে পথে' হচ্ছে সফরের আশ্চর্য সব বিবরণের সংকলন। এর জন্যে দরকার সাথী ভাই আল্লাহর রাস্তায় থাকার সময় অলৌকিক, রহস্যময়, ব্যাখ্যাতীত ঘটনার কথা। এমন কিছু যদি আপনার জীবনে থাকে বা কোন সাথী বা কোন জামাতের সাথে ঘটেছে তাঁরা দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সবার মঙ্গল হোক। আল্লাহ হাফিজ।

রমজানেই পাবেন



তিমির নিবিড় রাত্রি

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত।

বিশ্বসাহিত্যে এক নতুন মোড়। নতুন সংযোজন।

নতুন আয়োজন!

গতিশীল গল্পের মাঝ দিয়ে নাস্তিকতা আর আস্তিকতার আশ্চর্য সব দর্শন, মনস্তত্ব আর দিক নির্দেশনা আওড়ে গেছেন লেখক অবলীলায়।

ধর্ম সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, আবছা ধারণা রাখে এমন একদল বিকারগ্রস্তের লেখা উপন্যাস সর্বনাশ করে ছেড়েছে গত কয়েক প্রজন্মের। দুষ্টক্ষত আর দুষ্টগ্রহের মতো আমাদের ঔরসজাত সন্তানেরা আজ ডুবে আছে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি আর জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতার আঁধারে। তারা এখন আমাদের মাথার উপর চড়াও হয়েছে। বিভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দি ওরা কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে নীল নেশার শিকার। শেষ হচ্ছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবতা। বাড়ছে হিংসা, ঝগড়া, ফাসাদ, সন্ত্রাস, অবক্ষয়, অন্ধকার আর অহেতুক রক্তক্ষয়।

এদেশের প্রথম জনপ্রিয় উপন্যাস 'লালসালু' -ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এক পণ্ডিতের লেখা, বিকৃত তথ্যের সমাহার।

তারপর এলো 'সংশপ্তক'। এও সেই

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। একে একে আরো অনেক।

আহম্মদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদ, আরজ আলী, তাসলিমা, শফিকুর---

খুঁজে খুঁজে পথহারা মোল্লাদের চরিত্র বের করে অবুঝ অবোধ কচিমনের কিশোর, তরুণ, যুবক, যুবতীদের সামনে তাদের কুকর্ম তুলে ধরে ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ চেতনা তৈরি করার কারিগর ওই সব মহাপণ্ডিত, সাহিত্যিক। মহাজ্ঞানী, মহাজনেরা!

এদের চোখে পড়েনি সমাজের সেইসব মহান মোল্লা, মাওলানা, হুজুর (হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, হযরত আশরাফ আলী থানভী, কাশেম নানুতবী, আবুবকর সিদ্দিক, আবদুল হাই ফুরফুরাবী, মাওলানা ইলিয়াস, মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা জাকারিয়া, মাওলানা এনামুল হাসান, শামসুল হক ফরিদপুরি, আবদুল আজিজ, হাজী আবদুল মুকিত, মাওলানা আলী আকবর, মুফতি ফয়জুল্লাহ, মাওলানা আতাহার আলী, মাওলানা মুনির সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে। যাঁরা চরিত্রে, মননে , আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে সূর্যসম, দেবতূল্য। যাঁদের কল্যাণে আজো আমরা খানিকটা সুস্থ, সুন্দর সমাজ পাচ্ছি।

দুষ্টচক্র চক্রান্ত চালাচ্ছে।

এরা ছিল।

আজও আছে।

কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের সমাজকে।

এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, খড়গহস্ত, মারমুখী, দ্রোহী, নতুন সূর্য, বিপুল জোয়ার, স্বর্গসমীরণ, প্রাজ্ঞ গোলাপ, জ্বলন্ত প্রতিবাদ, অলৌকিক পারিজাত--

তিমির নিবিড় রাত্রি।

বইয়ের দোকানে বলে রাখুন।

আজই।